দ্য গড ডিবেট

ফেইথ ভার্সেস রিজন

সংকলন ও সম্পাদনায়-

নিয়ামত উল্লাহ আল আমিন ও কারিমা রিনথী

টুকিটাকি
সাহিত্য পরিষদ

সার্বিক ব্যবস্থাপনায়ঃ

টুকিটাকি সাহিত্য পরিষদ

নতুন ভাবনা, উন্নত জ্ঞান
ইচ্ছাশক্তি
প্র কা শ নী



দ্য গড ডিবেট ফেইথ ভার্সেস রিজন

সংকলন ও সম্পাদনায়-

নিয়ামত উল্লাহ আল আমিন ও কারিমা রিনথী

প্রথম প্রকাশ	অমর একুশে বইমেলা ২০২৬
©	সম্পাদক ও কবি
প্রচ্ছদ	ইচ্ছাশক্তি গ্রাফিক্স টিম
প্রকাশক	মোঃ নাছিম প্রাং
	ইচ্ছাশক্তি প্রকাশনী
	Mobile: 01975-274614, 01516-379064
	E-mail: ichchashakti22@gmail.com
কম্পোজ	এন.এস কম্পিউটার্স
	সর্বস্বত্ব সংরক্ষিত
সার্বিক ব্যবস্থাপনায়	টুকিটাকি সাহিত্য পরিষদ
অনলাইন পরিবেশক	রকমারি. কম, পিবিএস, ওয়াফিলাইফ ইচ্ছাশক্তি বুক শপ, বুক শেলফ
মূল্য	২৮০ টাকা মাত্র
The God Debate Faith vs Reason	Published by ichchashakti Prokashoni 34 Banglabazar, Dhaka-1100
	Price: BD Tk. 280
	ISBN: 978-984-29008-9-1

প্রকাশক এবং স্বত্বাধিকারীর লিখিত অনুমতি ছাড়া এ বইয়ের কোনো অংশের পুনরুৎপাদন বা প্রতিলিপি করা যাবে না। যান্ত্রিক উপায়ে কোনো প্রতিলিপি করা যাবে না। ডিস্ক বা তথ্য সংরক্ষণের কোনো যান্ত্রিক পদ্ধতিতে উৎপাদন বা প্রতিলিপি করা যাবে না। শর্ত লঙ্ঘিত হলে কপিরাইট অ্যাক্ট ২০০০ এর অর্ন্তগত ১৫ নম্বর অধ্যায় অনুযায়ী আইনি ব্যবস্থা গ্রহণ করা হবে।

উৎসর্গ

“দ্য গড ডিবেটঃ ফেইথ ভার্সেস রিজন”

গ্রন্থটি নিবেদিত মহান আল্লাহর প্রতি, যিনি ভূমন্ডল ও নভোমন্ডলের একমাত্র ও একচ্ছত্র রচয়িতা, জীবনের স্রষ্টা ও সমস্ত জ্ঞানের উৎস। তাঁর মহিমায় প্রশংসা জানাই, এবং উৎসর্গ করি মানবতার মুক্তির দিশারি, শেষ নবী হযরত মুহাম্মদ (সাঃ) -এর প্রতি, যিনি আলোর প্রদীপ হয়ে পথ দেখিয়েছেন হারানো মানবজাতিকে।

উৎসর্গ রইল সেই সকল চিন্তাশীল লেখক ও পাঠকের প্রতি, যারা ঈমান ও যুক্তির সেতুবন্ধনে বিশ্বাস রেখে অন্ধকার কুয়াশার মধ্য দিয়ে সত্য ও মুক্তির আলো অন্বেষণ করেন।

ভূ মি কা

শুরু করছি আসমান ও জমিনের সেই মহান প্রতিপালকের নামে, যিনি আমাদের সৃষ্টি করেছেন। যিনি মানবজাতিকে শ্রেষ্ঠত্ব দিয়ে ভালো-মন্দ বোধের জ্ঞান দিয়েছেন। দরূদ ও সালাম পেশ করছি বিশ্বমানবতার মুক্তির দূত হযরত মুহাম্মদ মুস্তফা (সাঃ) -এর প্রতি যাঁর আনীত বিধান আমাদের সত্য চিনিয়েছে, আলোকিত করেছে পথচলা।

এই গ্রন্থে এমন কিছু ইসলাম প্রিয় সাহিত্যিকের নির্বাচিত লেখা সংকলনের চেষ্টা করা হয়েছে, যাঁদের কলম মুসলিম পাঠকের হৃদয়ে শীতলতা অনুভব করাবে এবং নাস্তিকতার অহংকারকে যুক্তির বাণে ভেদ করবে। ইনশা আল্লাহ! যদিও গ্রন্থের কোনো লেখক পেশাদার আলেম, মুফতি কিংবা বিতার্কিক নন- কেউ ছাত্র, কেউ চাকুরিজীবী, ব্যবসায়ী কিংবা সাহিত্যসেবী। তাদের কোনো লেখায় উঠে এসেছে কুরআনের বাণী ও আধুনিক বিজ্ঞানের সাদৃশ্য, কোথাও যুক্তিনির্ভর বিশ্লেষণ, আবার কোথাও আত্মিক উপলব্ধির মর্মস্পর্শী প্রকাশ।

আলহামদুলিল্লাহ, এটি সম্ভবত বাংলা সাহিত্য অঙ্গনে একটি ব্যতিক্রমী যৌথ প্রয়াস, যেখানে সাহিত্যের গুরুত্বপূর্ণ শাখা- প্রবন্ধ, গল্প, কবিতা ও কথোপকথন সবকিছুই স্থান পেয়েছে, যেখানে বিভিন্ন শ্রেণি-পেশার লেখকেরা এক কণ্ঠে কলম ধরেছেন নাস্তিকতার বিরুদ্ধে।

গ্রন্থটি প্রকাশে যারা সম্পাদনা, পরিকল্পনা ও সার্বিক সহায়তায় যুক্ত ছিলেন, তাদের প্রতি রইল কৃতজ্ঞতা ও ভালোবাসা। যত যত্ন নিয়েই কাজ করা হোক, কোনো ভুল-ত্রুটি থেকে গেলে তা অনিচ্ছাকৃত এবং এজন্য ক্ষমাপ্রার্থী। পরিশেষে, পাঠকের দোয়া প্রত্যাশা করি।


দ্য গড ডিবেট ফেইথ ভার্সেস রিজন
সূচিপত্র

লেখক পরিচিতি পড়তে কিউআর কোডটি স্ক্যান করুন

নিয়ামত

লেখক- নিয়ামত উল্লাহ আল আমিন -এর ১টি গল্প

রোবট দ্বীপ

মনে করেন, এখন ২০২৫ নয় বরণ ৩০২৫ সাল! চারিদিকে সব রোবট আর রোবট। রোবটরা এখানে জীবনযাপন করছে শ'খানেক বছর চলছে। তাদের মাঝেও মারামারি, হানাহানি সবই চলছে। চলছে নতুন কিছু জানতে, শিখতে স্কুল-কলেজও। পাঠকের মনে হয়তো প্রশ্ন জাগবে যে, সব যদি রোবটই হয় তবে মানুষ কই? বলছিলাম রোবট দ্বীপের কথা। মানুষ পৃথিবীতে আছে। রোবটরাও পৃথিবীতেই। তথ্য প্রযুক্তির ক্রমাগত উন্নতির ফলে এমন পর্যায়ে পৌছেছে যে মানুষ এমন কিছু রোবট বানিয়েছে যাদেরকে মানুষের কাজে-কর্মে ব্যবহারের পূর্বে তারা মানুষের মত বুদ্ধিমত্তা অর্জন করেছে কিনা তা নিশ্চিত করতে কিছুকাল পরিক্ষাগারে রাখার সিদ্ধান্ত নেয়। জনমানবহীন একটি এলাকা। চারিদিকে পানি আর পানি। মাঝখানে ছোট্ট একটি পৃথিবী। হ্যাঁ! এটিই রোবট দ্বীপ। রোবটদের পরিক্ষাগার। ওই দ্বীপের বাহিরে যাওয়ার সাধ্য কোনো রোবটের নেই। মানুষ তাদের ওই দ্বীপে ছেড়ে দিয়েছে। তারা সেখানে মানুষের মতই বিচরণ করবে। জীবিকা নির্বাহ করবে, সংসার চালাবে। আর সমস্ত দ্বীপের গতিবিধি রেকর্ড হতে থাকবে অদৃশ্য কিছু ক্যামেরার মাধ্যমে। মানুষ যা সার্বক্ষণিক পর্যবেক্ষণ করবে। কিছুকাল যাওয়ার পর দেখা গেলো যে, রোবটরা বিপথে চলে যাচ্ছে দিন দিন। মারামারি হানাহানি লেগেই আছে। তখন মানুষ তাদের নিকট একটি প্রতিনিধি রোবট পাঠালো কিছু দিক নির্দেশনা, কিছু বিধিবিধান দিয়ে। সেই রোবট যখন এসব নির্দেশনা সম্পর্কে বললো, বিধিমালা সম্পর্কে জানালো, কেন তারা সবাই এই ছোট্ট দ্বীপে এসেছে, সব কিছু জানালো তখন বহুকাল ধরে বসবাস করা কিছু রোবট তার সাথে তর্কে জড়ালো।

- প্রতিনিধি রোবটঃ মানুষ আমাদের তৈরি করছে কিছুকাল পরীক্ষা করার জন্য। এরপর যারা উত্তীর্ণ হবে তাদেরকে একটি নতুন পৃথিবীতে নিয়ে যাওয়া হবে যেখানে মানুষরা বাস করে। এই দ্বীপে যা নেই সে জায়গায় তা আছে। কি অপরূপ সে জগৎ। আর যারা উত্তীর্ণ হতে পারবে না তাদের ময়লাস্তূপে ফেলে দেয়া হবে আজীবনের জন্য।

- বসবাসরত রোবটঃ মানুষ বলতে কিছুই নেই। তুমি কি সব আজগুবি কথাবার্তা বলছো! আমরা সবাই ডেমেজ হয়ে যাবো। এরপর একেবারে নিঃশেষ

হয়ে যাবো। আমাদের আর অস্তিত্ব থাকবে না। আমরা কোনো জগতেও যাবো না।

- প্রতিনিধি রোবটঃ মানুষ আমাদের তৈরি করেছে। ছোট ছোট যন্ত্রের সমন্বয়ে আমাদের শরীর তৈরি করেছে। মস্তিষ্ক দিয়েছে। একসময় আমরা ছিলাম কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তা সম্পন্ন। কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তা ছিলো আমাদের রুহের জগৎ। এখন আমরা নিজেরা চিন্তা করতে পারি। যা ইচ্ছে করতে পারি। মানুষ প্রথমে একজন রোবট তৈরি করেছে। এরপর তার থেকে আমাদের ছড়িয়ে দিয়েছেন।

- বসবাসরত রোবটঃ তোমার এসব আজগুবি কথাবার্তা আমরা বিশ্বাস করি না। আমরা জানি যে, আমরা টেলিফোন থেকে বিবর্তিত হয়েছি। টেলিফোন থেকে মুটোফোন, তা হতে স্মার্ট ফোন, তা হতে এন্ডয়িড, ট্যাব, ল্যাপটপ, কম্পিউটার এরপর রোবটে বিবর্তিত হয়েছি।

- প্রতিনিধি রোবটঃ আমরা টেলিফোন থেকে কিভাবে বিবর্তিত হয়েছি? যেখানে টেলিফোনের নিজস্ব কোনো বুদ্ধিমত্তা নেই। টেলিফোন রোবটের মত মানুষের তৈরি একটি যন্ত্র মাত্র। মুটোফোন, স্মার্টফোন, কম্পিউটার সবই বিভিন্ন জাতের যন্ত্র। আর আমরা হলাম যন্ত্রমানব। এ সব কিছু হতে আমাদের শ্রেষ্ঠত্ব দেওয়া হয়েছে। এসব জাতের যন্ত্র আমাদের উপকারের জন্যই তৈয়ার করেছে মানুষ।

- বসবাসরত রোবটঃ তুমি এসব কই পেয়েছো?

- প্রতিনিধি রোবটঃ এই যে এই ফাইলের ভেতর! যা তে মানুষের নির্দেশনা ও নীতিমালা রয়েছে। আর আমাকে প্রেরণ করা হয়েছে এই ফাইলের আলোকে তোমাদের দিক নির্দেশনা দিতে। আমাদের এই নীতিমালা মোতাবেক জীবন চালাতে হবে না হয় ডেমেজের পর হিসাবের সম্মুখীন হওয়া লাগবে।

- বসবাসরত রোবটঃ ওই সব রূপ কথার গল্প! মানুষ বলতে কেউ নেই! কোনো হিসাব হবে নাহ আমাদের ডেমেজের পর! আমরা আবারও তৈরি হবো না আর!

- প্রতিনিধি রোবটঃ যে বা যারা একবার তৈরি করতে পারে তার দ্বারা কি দ্বিতীয়বার তৈরি করা সম্ভব না?

- বসবাসরত রোবটঃ যাও তো ভাই! ওইসব গদ্য কথা ছাড়ো!

- প্রতিনিধি রোবটঃ গদ্য কথা নয় এটিই সত্য! মানুষ আমাদের পরীক্ষা করার জন্য এই পৃথিবীতে নীতিমালা দিয়ে পাঠিয়েছে! যে নীতিমালা সঠিকভাবে পালন করবে সে উত্তীর্ণ আর যে বিধিমালা মেনে চলবে নাহ সে অনুত্তীর্ণ হবে ডেমেজের পর!

- বসবাসরত রোবটঃ 😔 😔

লেখক পরিচিতি পড়তে কিউআর কোডটি স্ক্যান করুন

কারিমা

লেখিকা- কারিমা রিনথী -এর ১টি প্রবন্ধ

মহাবিশ্ব যদি হয় একক স্রষ্টার সৃষ্টি, তবে ধর্মসমূহের স্রষ্টা কেন ভিন্ন?

সূচনা •

মহাবিশ্বের অস্তিত্ব ও এর সুবিন্যস্ত গতিপ্রকৃতি এবং সৃষ্টির প্রতিটি পরতে এক মহান স্রষ্টার অস্তিত্বের সুস্পষ্ট ঘোষণা বিদ্যমান। বিজ্ঞানের প্রতিটি নতুন আবিষ্কার যেন সেই অদেখা সত্তার গুণগান করে এবং মহাবিশ্বের একত্ব প্রকাশ করে। কিন্তু মহাবিশ্বের স্রষ্টা যদি একজনই হন, তাহলে পৃথিবীতে এতগুলো ধর্ম কেন? কেন প্রত্যেক ধর্মে স্রষ্টার ধারণা ভিন্ন? এই প্রশ্নগুলো মানুষের মনে যুগে যুগে স্বাভাবিকভাবে সন্দেহের বিষাক্ত বীজ বপন করে এবং মানবজাতির দীর্ঘদিনের জিজ্ঞাসা হিসেবে দাঁড়ায়, বিশেষ করে যখন আমরা বিজ্ঞানের আলোকে মহাবিশ্বের একত্ব দেখি। অথচ ইসলামের আলোকে এই গভীর প্রশ্নের উত্তর এতটাই স্পষ্ট যে, এটি মুমিনের হৃদয়ে প্রশান্তির ঝর্ণা প্রবাহিত করে এবং কুফরের অন্ধকারে ডুবে থাকা কাফেরের হৃদয়ে আল্লাহর ভয়ের কম্পন সৃষ্টি করে। কোরআন মাজিদের আয়াত, সহিহ হাদিসের বর্ণনা ও নির্ভুল রেফারেন্সসমূহ এবং বৈজ্ঞানিক যুক্তির গভীর অনুসন্ধান যা একসাথে সংমিশ্রিত হয়ে প্রমাণ করে যে স্রষ্টা একজনই "আল্লাহ”, যিনি সকল মানবজাতির জন্য একই বার্তা পাঠিয়েছেন এবং ধর্মের উৎস'ও এক। কিন্তু মানুষের বিদ্রোহ, হস্তক্ষেপ ও বিকৃতির কারণে ধর্মের উৎস থেকে বহুত্ব এসেছে। এই প্রবন্ধে আমরা এই সত্য উন্মোচন এবং বিষয়টি বিশ্লেষণ করবো, যাতে আস্তিকের ঈমান দৃঢ় হয় এবং নাস্তিকের অজ্ঞতা দূর হয়।

কুরআন ও হাদিসের দৃষ্টিকোণ ও যৌক্তিকতা •

ইসলামের মৌলিক বিশ্বাস হলো, মহাবিশ্বের স্রষ্টা একক এবং অদ্বিতীয়– “আল্লাহ তা-আলা”, যিনি সকল কিছুর উর্ধ্বে এবং অভেদ্য। কোরআন তাওহীদের এই সারাংশ তুলে ধরে–

“বলো, তিনি আল্লাহ, এক-অদ্বিতীয়। আল্লাহ অমুখাপেক্ষী, সকলেই তাঁর মুখাপেক্ষী। তিনি কাউকে জন্ম দেননি এবং তাঁকেও কেউ জন্ম দেয়নি। এবং তাঁর সমতুল্য কেউই নেই”। *[সূরা আল-ইখলাস, (১১২:১-৪)]*

আবার–

"আর তোমাদের উপাস্য একইমাত্র উপাস্য, তিনি ব্যতীত আর কোনো উপাস্য নেই। তিনি পরম দয়াময়, পরম দয়ালু"। *[সূরা আল বাকারা, (২:১৬৩)]*
ইসলাম শিক্ষা দেয় যে, ধর্মের উৎস এক– "ইসলাম", যা আল্লাহর আনুগত্য। এর ব্যাখায় কোরআন বলে–
"তিনি (আল্লাহ) তোমাদের জন্য বিধিবদ্ধ করেছেন দ্বীন, যার নির্দেশ দিয়েছিলেন তিনি নূহ্কে এবং যা আমি ওহী করেছি তোমাকে এবং যার নির্দেশ দিয়েছিলাম ইব্রাহীম, মূসা ও ঈসাকে। এই বলে যে, তোমরা দ্বীনকে প্রতিষ্ঠিত করো এবং এতে মতভেদ করো না"। *[সূরা আশ-শুরা, (৪২:১৩)]*
এই আয়াতসমূহ সহিহ ও অবিকৃত এবং স্পষ্ট করে যে, সব নবীকে একই ধর্ম দেওয়া হয়েছে এবং আল্লাহ তা'আলা মানবজাতিকে অন্ধকার থেকে আলোর পথে নিয়ে আসার জন্য যুগে যুগে অসংখ্য নবী-রাসূল প্রেরণ করেছেন। তিনি প্রত্যেক জাতিতে রাসুল পাঠিয়েছেন, এই বিষয়ে পবিত্র কোরআনে আল্লাহ বলেন– "আর এমন কোনো সম্প্রদায় নেই, যার কাছে সতর্ককারী আসেনি"। *[সূরা ফাত্বির, (৩৫:২৪)]*

আবার–
"আমি প্রত্যেক জাতির মধ্যেই রাসূল পাঠিয়েছি এই মর্মে যে, 'তোমারা আল্লাহর ইবাদত করো এবং তাগুত থেকে নিরাপদ থাকো"। *[সূরা আন-নাহল, (১৬:৩৬)]*
এই আয়াতসমূহের মাধ্যমে বোঝা যায়, প্রতিটি জাতির কাছেই সত্যের বাণী পৌঁছে দেওয়া হয়েছে। সেই সত্যের মূল বার্তা ছিলো এক ও অভিন্ন– "আল্লাহর একত্ববাদ বা তাওহীদ"। আদম (আঃ) থেকে শুরু করে নূহ (আঃ), ইবরাহীম (আঃ), মূসা (আঃ), ঈসা (আঃ) এবং সর্বশেষ রাসূলুল্লাহ মুহাম্মদ (সাঃ) পর্যন্ত সকল নবীর দাওয়াত ছিল একই। অর্থাৎ, আল্লাহ এক, তাঁর কোনো শরীক নেই এবং তিনিই একমাত্র উপাসনার যোগ্য। কিন্তু মানুষের লোভ, বিদ্রোহ ও শয়তানের প্ররোচনায় ধর্মগুলো বিকৃত হয়েছে। যেমন, তাওরাত ও ইঞ্জিলকে মানুষ পরিবর্তন করেছে, কিন্তু কুরআন অভেদ্য–
"আমি (আল্লাহ) স্বয়ং এই উপদেশ গ্রন্থ অবতারণ করেছি এবং আমি নিজেই এর রক্ষাকর্তা"। *[সূরা আল-হিজর, (১৫:৯)]*

অতএব, ইসলামের দৃষ্টিকোণ থেকে কখনো একাধিক স্রষ্টা ছিলো না এবং না ছিলো একাধিক ধর্ম। বরং মানুষের বিভ্রান্তি, বিকৃতি এবং সাংস্কৃতিক প্রেক্ষাপটে সৃষ্ট বিভিন্ন মতবাদ-ই আজকে বিভিন্ন ধর্মের জন্ম দিয়েছে। ধর্মের বহুত্বের কারণ মানুষের আদ্য ফিতরাহ (স্বাভাবিক একত্ববাদী প্রকৃতি) থেকে বিচ্যুতি, যা

শয়তানের প্ররোচনা, লোভ এবং ইচ্ছাশক্তির অপব্যবহারে ঘটে। বিষয়টি আরো সুস্পষ্ট করার জন্য একটি শক্তিশালী হাদিস উল্লেখ করা যায়, যেমন:
আবু হুরায়রা (রা:) থেকে বর্ণিত রাসূলুল্লাহ (সাঃ) বলেন–
"প্রত্যেক শিশু ফিতরাতের উপর জন্মগ্রহণ করে। এরপর তার পিতা-মাতা তাকে ইয়াহুদী বা খ্রিস্টান অথবা অগ্নি উপাসকরূপে রূপান্তর করে"। *[সহিহ বুখারী: ১৩০২ / আন্তর্জাতিক: ১৩৫৮]*

আরেক হাদিস এসেছে, আউফ ইবনে মালেক (রাঃ) থেকে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ (সাঃ) বলেন–
"ইয়াহুদীরা ৭১ বা ৭২ ফিরকায় বিভক্ত হয়েছে, নাসারারাও ৭১ বা ৭২ ফিরকায় বিভক্ত, এবং আমার উম্মাহ ৭৩ ফিরকায় বিভক্ত হবে। তাদের সবাই জাহান্নামে যাবে, একটি দল ছাড়া"।
সাহাবীরা জিজ্ঞাসা করলেন, "ইয়া রাসূলাল্লাহ, সেই দল কারা"? তিনি বললেন– "জাম'আত" (অর্থাৎ যারা নবীজী (সাঃ) এবং তাঁর সাহাবীদের পথ অনুসরণ করবে। *[সুনান আবু দাউদ: ৪৫২৫ / সুনান ইবনে মাজাহ: ৩৯৯২]*

এই হাদিসসমূহ প্রমাণ করে যে, মানুষ জন্মগতভাবে এক স্রষ্টায় বিশ্বাসী, কিন্তু সমাজ ও পরিবেশ তাকে বিপথগামী করে। মূলত, সময়ের বিবর্তনে এবং মানুষের প্রবৃত্তির দুর্বলতার কারণে ঐশী বার্তায় পরিবর্তন হয়েছে। কিছু মানুষ তাদের ব্যক্তিগত স্বার্থ চরিতার্থ করার জন্য, সমাজে নিজেদের আধিপত্য প্রতিষ্ঠার জন্য অথবা নিছক অজ্ঞতার কারণে স্রষ্টার মূল বার্তা থেকে বিচ্যুত হয়ে ভিন্ন পথ তৈরি করেছে। তারা বিভিন্ন দেব-দেবী, প্রতিমা, এমনকি নিজেদের বানানো কল্পিত স্রষ্টার উপাসনা শুরু করে। আল্লাহ এই বিষয়ে কোরআনে বলেন–
"সমস্ত মানুষ কেবল একই দ্বীনের অনুসারী ছিলো। তারপর তারা পরস্পরের মতভেদ লিপ্ত হয়ে পৃথক হয়ে যায়"। *[সূরা ইউনুস, (১০:১৯)]*

এই মতভেদই কালক্রমে বিভিন্ন ধর্ম ও বিশ্বাসে রূপান্তরিত হয়েছে, যার মূলে রয়েছে মানুষেরই তৈরি বিচ্যুতি ও বিভাজন। কোরআনে এই বিচ্যুতির সমাধান হিসেবে এসেছে–
"যে ব্যক্তি বিশ্বাসের বিষয় অবিশ্বাস করে, তার শ্রম বিফলে যাবে এবং পরকালে সে ক্ষতিগ্রস্ত হবে"। *[সূরা আল-মায়িদাহ, (৫:৩)]*

মূলত ঐশীগ্রন্থের বিকৃতি মানবজাতির জন্য একটি পরীক্ষা। ইসলাম বিশ্বাস করে যে, আল্লাহ মানবজাতিকে পৃথিবীতে পাঠিয়েছেন পরীক্ষা করার জন্য। এই পরীক্ষার একটি অংশ হলো, সঠিক পথ কোনটি তা খুঁজে বের করা। আল্লাহ মানুষকে স্বাধীন ইচ্ছাশক্তি দিয়েছেন। মানুষ চাইলে আল্লাহর দেওয়া পথ অনুসরণ করতে পারে, আবার চাইলে নিজেদের মনগড়া পথেও চলতে পারে। আল্লাহ তা'আলা পবিত্র কোরআনে এই বিষয়ে বলেন–

"দ্বীন গ্রহণে কোনো জবরদস্তি বা বাধ্য-বাধকত নেই। নিঃসন্দেহে হেদায়াত গোমরাহী থেকে পৃথক হয়েছে। এখন যে গোমরাহকারী 'তাগুত'দেরকে অস্বীকার করবে এবং আল্লাহর ওপর ঈমান আনবে, সে এমন এক মজবুত হাতল ধরবে যা কখনও ভাংবার নয়। আর আল্লাহ্ সর্বশ্রোতা, প্রজ্ঞাময়"। *[সূরা আল-বাকারাহ, (২:২৫৬)]*

আল্লাহ আরও বলেন–

"তিনিই আল্লাহ, যিনি তোমাদের প্রতিপালক। তিনিই প্রতিটি জিনিসের স্রষ্টা, তিনি ছাড়া কোন মাবুদ নেই। অতএব কোথা হতে কোন বস্তু তোমাদেরে বিভ্রান্তকরে বিপথগামী করছে"? *[সূরা আল মুমিন, (৪০:৬২)]*

উপরোক্ত বিশ্লেষণে সুস্পষ্ট ভাবে প্রমাণিত যে মহাবিশ্বের স্রষ্টা একক এবং অদ্বিতীয়– "আল্লাহ তা-আলা" এবং একমাত্র সত্য ধর্ম– "ইসলাম"।

অতএব মুমিন ভাই ও বোনেরা, আপনার অন্তর যেন আল্লাহ্র সাথে সংযোগ অনুভব করে। মনে রাখবেন, যদিও ধর্মের বিভাজন ভয়ানক মনে হতে পারে, তবে তার মূলে রয়েছে মানবজাতির মুক্ত ইচ্ছা, ভুল পথ ও শয়তানী প্ররোচনা। কিন্তু আল্লাহ্ আপনার জন্য দিয়েছেন পূর্ণ নির্দেশনা, শান্তির বিবরণ ও পথ; যা আপনি কোরআন ও সহিহ হাদিস অনুসারে অনুসরণ করলে পরিচ্ছন্ন বিশ্বাসে স্থিত হবেন।

বিজ্ঞানের দৃষ্টিকোণ ও যৌক্তিকতা •

বিজ্ঞান আমাদের মহাবিশ্বের গঠন ও কার্যপ্রণালী সম্পর্কে গভীর জ্ঞান প্রদান করে, যা পদার্থবিজ্ঞান, জ্যোতির্বিজ্ঞান এবং জীববিজ্ঞানের গবেষণা থেকে উদ্ভূত। এই গবেষণা প্রকাশ করে যে, মহাবিশ্ব একটি সুসংহত ও সুশৃঙ্খল নিয়মের অধীনে পরিচালিত হচ্ছে, যেখানে প্রতিটি কণা, গ্রহ-নক্ষত্র এবং জীবজগতের উপাদান নির্দিষ্ট নিয়মাবলী অনুসরণ করে। মহাবিশ্বের সম্প্রসারণ, ডার্ক ম্যাটার, কৃষ্ণগহ্বর এবং মহাকর্ষীয় তরঙ্গের মতো জটিল ঘটনা এই নিখুঁত বিন্যাসকে

তুলে ধরে, যা একক এবং শক্তিশালী সত্তার অস্তিত্বের দিকে ইঙ্গিত করে। বিজ্ঞানের দৃষ্টিকোণ থেকে, একাধিক সৃষ্টিকর্তার ধারণা যৌক্তিক নয়, কারণ তাদের মধ্যে ক্ষমতার দ্বন্দ্ব সৃষ্টি হলে মহাবিশ্বের সুশৃঙ্খলতা ভেঙে পড়ত। কুরআনে এই যুক্তি প্রতিফলিত–

“যদি নভোমন্ডল ও ভূমন্ডলে আল্লাহ ব্যতীত আরও উপাস্য থাকত, তাহলে উভয়ই ধ্বংস হয়ে যেত”। [সূরা আল-আম্বিয়া, (২১:২২)]

এটি একটি দার্শনিক ও বৈজ্ঞানিক যুক্তি। মহাবিশ্বের নিয়ম এতো নিখুঁতভাবে চলতে পারে কেবল তখনই, যখন এর নিয়ন্ত্রক একজনই। এই আয়াত বিজ্ঞানীয় সঙ্গতিপূর্ণ, কারণ সকল অণু-পরমাণু একই নিয়মে চলে, কোয়ান্টাম ফিজিক্স থেকে ডিএনএ-র জটিলতা পর্যন্ত সবকিছু একক নকশার প্রমাণ বহন করে। নাস্তিক যুক্তি যেমন বিবর্তন বা সুযোগক্রমে সৃষ্টিকে প্রস্তাব করে, কিন্তু কুরআন প্রশ্ন করে–

“তারা কি স্রষ্টা ব্যতীত সৃষ্ট হয়েছে? নাকি তারাই (নিজেদের) স্রষ্টা”? *[সূরা আত-তুর, (৫২:৩৫)],* যা তাদের অজ্ঞতাকে উন্মোচিত করে।

জিনোম গবেষণা প্রমাণ করে যে, মানবজাতির জেনেটিক উৎস অভিন্ন, যা একক স্রষ্টার ধারণাকে শক্তিশালী করে। পৃথিবীর একত্ব দেখায় যে, যদি একাধিক স্রষ্টা থাকতো, তবে বিভক্ত পরিচালনা বিশৃঙ্খলা সৃষ্টি করতো, কিন্তু বাস্তবে অবিচ্ছিন্ন ক্রিয়াকাণ্ড একক শক্তির উপস্থিতি নির্দেশ করে। সমন্বয়হীনতা সৃষ্টিকে অচল করতো, কিন্তু প্রকৃতিতে শূন্য থেকে জীব এবং পরিবেশের পরস্পর সম্পর্ক একক নিয়ন্ত্রকের প্রমাণ। কোরআনের বিভিন্ন স্থানে সুস্পষ্ট উল্লেখ আছে যে প্রত্যেক নবী তাঁর জাতিকে একত্ববাদের (তাওহীদ) দিকে আহ্বান করেছেন–

“হে আমার সম্প্রদায়, তোমারি আল্লাহর ইবাদত করো। তিনি ছাড়া তোমাদের আর কোনো মাবুদ নেই”। *[সূরা আল-আরাফ, (৭:৫৯, ৭:৬৫, ৭:৭৩, ৭:৮৫)],* যা সকল ধর্মের মূলে একত্ববাদের শিক্ষা তুলে ধরে।

এই একত্ববাদ শুধু আধ্যাত্মিক নয়, বরং মহাবিশ্বের ভারসাম্যের বৈজ্ঞানিক ব্যাখ্যা প্রদান করে।

অজ্ঞাত মূর্খ কাফের যখন বিভাজন দেখে প্রশ্ন করবে– “স্রষ্টা যদি এক হয়, তাহলে ধর্মে এতো বিভাজন কেন”?

জ্ঞানী মুমিন হিসেবে যেন তখন আপনার উত্তর হয়– “মানুষ বিভ্রান্ত হয়েছে;

কিন্তু আল্লাহ্ সুবহানাহু ওয়া তা-আলা আমাদের ফেরিয়ে এনেছেন একতা ও সত্যপথে এবং আমাদের ঈমান রাখলে তাঁর আরাধনার মাধ্যমে অন্তরে প্রশান্তি ও সত্যের প্রমাণ প্রতিষ্ঠিত হয়"।

উপসংহার •

মহাবিশ্বের কর্তা যদি একজনই থাকেন, তাহলে এত ধর্মের বৈচিত্র্য কেন–এই গভীর প্রশ্নের উত্তর স্পষ্ট: ধর্মের ভিন্নতা মানবসৃষ্ট, যা অজ্ঞতা, স্বার্থ, সামাজিক প্রভাব, বিদ্রোহ ও বিচ্যুতির ফলস্বরূপ উদ্ভূত হয়েছে। আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তা ' আলা যুগে যুগে তার নবী-রাসূলদের মাধ্যমে মানবজাতির জন্য একই বার্তা পাঠিয়েছেন, কিন্তু মানুষ সেই মূল সত্য থেকে দূরে সরে গিয়ে নিজেদের জন্য ভিন্ন পথ তৈরি করেছে। বিভিন্ন ধর্ম সেই প্রেরিত বার্তার বিকৃত রূপ মাত্র, যেখানে ইসলামই চূড়ান্ত এবং অবিকৃত ধর্ম হিসেবে দাঁড়িয়ে আছে। আল্লাহ্ তাআলা বলেন–

"বস্তুত এ উপদেশ বাণী (কোরআন) আমি অবতীর্ণ করেছি এবং আমি এর রক্ষাকর্তা"। *[সূরা আল-হিজর, (১৫:৯)]*

অতএব, বিজ্ঞানের একত্ববাদী বাস্তবতা, মহাবিশ্বের প্রসারণ, সুশৃঙ্খলতা ও নিয়মাবলীর সাথে মিলেমিশে যায় এবং প্রমাণ করে যে শৃঙ্খলা এক নিয়ন্ত্রকেরই নিদর্শন এবং একক স্রষ্টার অস্তিত্ব যুক্তির সাথে সঙ্গতিপূর্ণ।

এই প্রবন্ধে আমরা দেখেছি, ইসলামিক দৃষ্টিতে ধর্মের বিভাজন মানুষের কারণে হলেও, আল্লাহ প্রতিটি যুগে নবোদিত শরিয়াহের মাধ্যমে সত্যপন্থা বজায় রেখেছেন। এটি মুমিনের হৃদয়ে পরম প্রশান্তির ঝর্ণা প্রবাহিত করে এবং কাফিরের মনে মহাভয়ের সচেতনতা জাগিয়ে দেয়, কারণ–

"যে ব্যক্তিই ইসলাম ছাড়া অন্য কোন'ও ধর্ম তালাশ করবে, কস্মিনকালেও তার থেকে সে দ্বীন কবুল করা হবে না এবং আখিরাতে সে মহা ক্ষতিগ্রস্তদের অন্তর্ভুক্ত হবে"। *[সূরা আলে-ইমরান, (৩:৮৫)]*

মুসলিম হিসেবে আমাদের দায়িত্ব সেই মূল সত্যকে আঁকড়ে ধরা এবং সকল বিভ্রান্তির ঊর্ধ্বে উঠে আল্লাহর একত্ববাদে দৃঢ় বিশ্বাস স্থাপন করা। অবিশ্বাসীদের জন্য এই আহ্বান সুস্পষ্ট–এই মহাবিশ্বের কোনো অংশই স্রষ্টা নয়, বরং এর স্রষ্টা এক, যিনি সমগ্র বিশ্বজগতের প্রতিপালক। যারা এই সত্যকে উপেক্ষা করে, তাদের জন্য রয়েছে মহাভয়, আর যারা বিশ্বাস করে, তাদের জন্য রয়েছে হৃদয়ের পরম প্রশান্তি। এই সত্যের সামনে কোনো দ্বিধা বা সংশয় থাকার অবকাশ নেই।

লেখক পরিচিতি পড়তে কিউআর কোডটি স্ক্যান করুন

শাহরিন

লেখক- শাহরিন বিনতে রবিউল -এর ৩টি প্রবন্ধ

"আল্লাহ" নামে কি আদৌ কোন অস্তিত্ব আছে?

অনেক বছর পর ঢাকায় আন্টির বাসায় বেড়াতে এসেছি। বিকেল বেলা আকাশ বিলাসে ছাদে উঠেছি। ছাদে বাহিরের কোন পুরুষ আসে না কিন্তু এখানে মেয়েদের একটি মেস আছে তারাই মাঝে মধ্যে আসে।

দাড়িয়ে আছি। হঠাৎ শুনতে পেলাম। 'হ্যালো, আসতে পারি'? পিছন ফিরে তাকিয়ে দেখলাম একটি মেয়ে। তাকে আগে কখনও দেখিনি কিংবা চিনিও না।

- সে বলল, 'আপনি ইসমাত রাইট'?

- জ্বী।

- সে বলতে শুরু করলো, ভয় পাবেন না। আমি স্মৃতি। এই বাসার মেসে থাকি। আপনার খালাতো বোন ফাতেমা আমাকে আপনার কথা বলেছে।

- ও আচ্ছা! কেমন আছেন?

- Always Fine. You?

- আলহামদুলিল্লাহ ভালো।

এটি শুনে মেয়েটি আমার দিকে ভিন্ন কৌতুহল নিয়ে তাকিয়ে আছে। বুঝতে পারছি না কাহিনীটা কি।

- আপনার কোন আপত্তি না থাকলে আমি আপনার থেকে একটি বিষয় জানতে পারি?

- জ্বী অবশ্যই, বলুন।

- সৃষ্টিকর্তা বলতে কেউ আছে তা কি আপনি বিশ্বাস করেন?

- হুম অবশ্যই করি। পৃথিবীর একমাত্র সৃষ্টিকর্তা হলেন আল্লাহ তা-আলা আর সর্বশেষ এবং সর্বশ্রেষ্ঠ নবী ও রাসূল হযরত মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম।

- আচ্ছা, আমি মেনে নিলাম আপনার কথা। আপনি বললেন সৃষ্টিকর্তা আছে এবং তিনি হলেন আল্লাহ।

- আচ্ছা বলুন তো, ফিলিস্তিন বাসীরা প্রভু হিসেবে কাকে বিশ্বাস করেন?

- পুরো জাহানের একমাত্র সৃষ্টিকর্তা আল্লাহ তা-আলাকে।

- এবার আমাকে বলুন, ফিলিস্তিনের জনগণ এত বছর যাবত ইসরাইলের থেকে মাইর খেয়ে আসছে যদি তাদের আল্লাহ আসলেই থাকতো তাহলে ফিলিস্তিনবাসী আল্লাহর কাছ থেকে কোন সাহায্য পাচ্ছে না কেন? যদি ফিলিস্তিন বাসীদের সৃষ্টিকর্তা আসলেই থাকতো তাহলে অবশ্যই তাদেরকে সাহায্য করতো। এটি দ্বারা স্পষ্ট বোঝা যায় না যে, আসলে আল্লাহ নামে এমন কেউই নেই।

- আমি চুপ করে মেয়েটির কথা শুনছি। অবাক হচ্ছি না কারণ প্রায়ই কেউ না কেউ এসে ইসলাম নিয়ে তর্ক তোলে। এসবে আমি অভ্যস্ত। কিছুটা রাগ চলে এসেছিল তবুও নিজেকে মানিয়ে নিয়েছি। ইসলাম শান্তির ধর্ম। এখানে জোরাজোরি নেই। ধৈর্য্য এবং মাধুর্যের সাথে দ্বীন প্রচার করা রাসূলের সুন্নাত। মেয়েটি আমার চুপ করা দেখে খুশি। সে ভাবছে আমি তার কথা মেনে নিয়েছি।

- এবার আমি বললাম, হুম আপনার লজিকটা সুন্দর কিন্তু এই লজিক দিয়ে সৃষ্টিকর্তা নেই তা প্রমাণ করা যায় না। আল্লাহর অস্তিত্বের প্রমাণ সারাটা বিশ্বে আশেপাশে ছড়িয়ে আছে। আপনি ইতিহাস পড়েন?

- হুম পড়ি।

- তাহলে শুনুন, ১৪০০ বছর আগে রোমান এবং পারস্যে যুদ্ধ শুরু হয়। তখন ছিল রাসূলের যুগ। রোমের সীমানা ছিল সিরিয়া থেকে পশ্চিমে স্পেন পর্যন্ত। আর পারস্যের সীমানা ছিল ইরাক থেকে পূর্বে খোরাসান (আফগানিস্তান) পর্যন্ত। পার্সিয়ানরা একের পর এক রোমানদের অঞ্চল দখল করেই চলছিল। তাদের উদ্দেশ্য ছিলো নিজ আধিপত্য বিস্তার করা। ৫৪ খ্রিস্টপূর্বাব্দ থেকে ৬২৮ খ্রিস্টাব্দ পর্যন্ত দুই সম্রাজ্ঞে যুদ্ধ চলে। তখন মক্কায় কাফেররা মুসলমানদের সাথে ঘোর শত্রুতামী করছিল। পার্সিয়ান দের হাতে রোমানরা বার বার মাইর খাওয়ার কারণে মক্কার মুশরিকরা খুশি হচ্ছিলো এবং ইসলাম নিয়ে ঠাট্টা মশকরা করতে থাকে কারণ, রোমানরা ছিলো মুসলিমদের মতো এক প্রভু, নবী এবং আসমানী কিতাবে বিশ্বাসী (খ্রিস্টান) আর পার্সিয়ান রা ছিলো, মুশরিকদের মতো বহু দেব দেবতায় বিশ্বাসী (ইয়াহুদী)। হারতে হারতে রোমানরা এমন জায়গায় পৌঁছে, তাদের আর উঠে দাঁড়ানোর ক্ষমতা থাকে না। সহসা পারস্যের বিরুদ্ধে বিজয় অর্জন করা কোন দূরতম সম্ভাব্য ও চোখে পড়ছিল না। সবাই মনে করতে থাকে তাঁদের পতন এবং পরাজয় নিশ্চিত। সে সময় রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের উপর অহী নাজিল হয় "রোমাকরা পরাজিত হয়েছে নিকটবর্তী অঞ্চলে; কিন্তু তারা তাদের এই পরাজয়ের পর শীঘ্রই বিজয়ী হবে কয়েক বছরের মধ্যেই। পূর্বের ও পরের

সিদ্ধান্ত আল্লাহরই। আর সেদিন মুমিনরা হর্ষোৎফুল্ল হবে আল্লাহর সাহায্যে, তিনি যাকে ইচ্ছা করেন সাহায্য করেন এবং তিনি পরাক্রমশালী, পরম দয়ালু"। *(সূরা রুম: ২-৫)*

এই ভবিষ্যৎ বাণী সকলের কাছে পৌঁছে দেওয়া হয়। মক্কার মুশরিকরা হাসাহাসি করতে থাকে। যারা কিনা নিজ সর্ব হারিয়ে নিঃস্ব তারা বিজয়ী হবে রোমান সাম্রাজ্যের সাথে! এক মুশরিক আবু বকর (রাঃ) সাথে রোমানদের বিজয় নিয়ে ১০০ উট বাজি ধরে (তখনও ইসলামে বাজি ধরা হারাম হয়নি)। পরবর্তীতে ৬২৮ খ্রিস্টাব্দে যখন রোমানরা পার্সিয়ান দের উপর বিজয় লাভ করে তখন মুশরিকরা হতভম্ব হয়ে পড়ে এবং বাজি ধরা মুশরিক আবু বকর রাঃ কাছে ১০০ উট নিয়ে আসে। তিনি সেগুলো রাসূলের দরবারে এনে উনার পরামর্শে দান করে দেন। আয়াতে বলা হয়েছে, "সেদিন মুমিনরা হর্ষোৎফুল্ল হবে-আল্লাহর সাহায্যে" হয়েছিল। সেদিনই আল্লাহ তা-আলা মুসলিমদের বড় বিজয় বদর যুদ্ধে দান করেছিল এবং আয়াতের প্রথম অংশে বলা আছে, "রোমাকরা পরাজিত হয়েছে নিকটবর্তী অঞ্চলে"। আধুনিক ভূতাত্ত্বিক গবেষণায় পাওয়া গেছে, পৃথিবীর সবচেয়ে নিচু অঞ্চল হচ্ছে জর্দান নদীর তীরবর্তী একটি অঞ্চল। আর এখানেই পার্সিয়ানরা রোমানদের পারাজিত করে ছিল। অথচ সেই অঞ্চল পৃথিবীর স্থলভাগে সবচেয়ে নিচু তা আমরা জানতে পেরেছি মাত্র কিছু বছর আগে।

- এখন বোন, আপনি কি রোমানদের বিজয়কে অস্বীকার করতে পারবেন?'

মেয়েটি কিছু বলছে না। চুপ করে আছে। ততক্ষণে ফাতেমা আমার পাশে এসে দাঁড়িয়েছে।

- মেয়েটি বললো, হুম সত্য, রোমানরা পার্সিয়ানদের উপর বিজয় লাভ করেছিল।

- তবে এবার বলুন, আল্লাহ যদি সত্যিই না থেকে থাকে তাহলে সেদিন রোমানদের পরাজয়ের নিচু স্থান এবং অসম্ভাব্য বিজয় সম্পর্কে ভবিষ্যৎ বাণী এবং তা পরিপূর্ণ বাস্তবায়ন হলো কিভাবে? এটা মানছি আল্লাহ সত্য আছেন। তাহলে এখন ফিলিস্তিন বাসীদের তিনি সাহায্য করছেন না কেন?!

শাম (সিরিয়া, জর্ডান, লেবানন এবং ফিলিস্তিন) দেশ নিয়ে রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম অনেক ভবিষ্যৎ বাণী করেছেন। এটি মুসলিমদের জন্য পবিত্র ভূমি এবং প্রথম কাবা। ভবিষ্যৎ বাণীগুলোর মধ্যে কয়েকটি-

আবু উমামা (রা:) থেকে বর্ণিত, রাসুলুল্লাহ (সা:) বলেন, আমার উম্মতের একটি দল সবসময় সত্যের ওপর প্রতিষ্ঠিত থাকবে। তারা শত্রুর বিরুদ্ধে সাহসিকতায়

টিকে থাকবে এবং শত্রুরা তাদের বিরুদ্ধে কিছুই করতে পারবে না- শুধু দুর্ভিক্ষ ছাড়া কোনো ক্ষতি সাধন করতে পারবে না। এ অবস্থা কেয়ামত পর্যন্ত অব্যাহত থাকবে। সাহাবিরা তখন জিজ্ঞেস করেন, 'হে আল্লাহর রাসুল, তারা কোথায় অবস্থান করবে'? উত্তরে রাসুলুল্লাহ (সা:) বলেন, 'তারা বায়তুল মাকদিস ও তার পার্শ্ববর্তী এলাকায় থাকবে'। *(মুসনাদে আহমদ : ২২৩২০)*

অন্য একটি হাদিসে রয়েছে- "রাসুলুল্লাহ (সা.) বলেছেন, তোমরা শামের প্রতি মনোযোগ দাও, কেননা আল্লাহ তা-আলা আমার জন্য এবং আমার উম্মতের জন্য শামকে দায়িত্ব দিয়েছেন"। *(সুনানে আবু দাউদ: ২৪৮৩)*

অন্য এক হাদিসে আছে, আবু হুরায়রা (রাঃ) থেকে বর্ণিত, রাসূল (সাঃ) বলেছেন, "কেয়ামত সংঘটিত হবে না যতক্ষণ না মুসলমানরা ইহুদি সম্প্রদায়ের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করবে। মুসলমানরা তাদের হত্যা করবে এবং তখন তারা পাথর বা গাছের আড়ালে আত্মগোপন করবে। তখন পাথর বা গাছ বলবে, 'হে মুসলিম, হে আল্লাহর বান্দা! এখানে ইহুদি রয়েছে, আসো, তাকে হত্যা কর। তবে গারকাদ গাছ এ কথা বলবে না, কারণ এটি ইহুদিদের গাছ'।" *(সহিহ মুসলিম: ৭০৭৫)*

আপনি দেখবেন, এই ভবিষ্যৎ বাণী গুলোর ভিতরে অনেক গুলোই বাস্তবায়ন ঘটেছে। ইয়াহুদিরা অত্যাচার করছে ফিলিস্তিন বাসীদের উপর। দূর্ভিক্ষ দিয়ে পুরো দেশটিকে ঘিরে রেখেছে। তবুও ফিলিস্তিন বাসীদের পক্ষ থেকে একদল লড়ে যাচ্ছে দ্বীনের জন্য। তাঁরা জালিমদের কাছে হার মানছে না। এটি রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আরো চৌদ্দশ বছর আগে বলে গিয়েছেন।

৯ই আগস্ট ২০২৫ইং যমুনা টিভির নিউজে দেখা গেছে ফিলিস্তিনি এক মা বলছেন- "আমরা জীবন দিয়েছি আরো দিবো তবুও নিজ দেশ ছাড়বো না"!

শামকে পুরো উম্মতের হাতে দেওয়া হয়েছে। কিন্তু আজ অনেক বড়-বড় মুসলিম দেশগুলোও ফিলিস্তিনের পাশে নেই। এখানে আমরা হেরে গেছি আর ফিলিস্তিন বাসীরা স্বীয় রবের দরবারে জান্নাতের খাতায় নাম লিখিয়েছে। যেভাবে আল্লাহ তাআলা রোমানদের বিজয় দান করেছিলেন ঠিক সেভাবে ফিলিস্তিন বাসীদের ও বিজয়ী করবেন। এটা তো শুধুমাত্র পরীক্ষা। নয়তো তাঁদের বিজয় এবং পবিত্রতার ভবিষ্যৎবাণী তো ১৪০০ বছর আগেই করে গিয়েছেন।

- মেয়েটি আমাকে বললো, Okay, I'm understand.
- আমি বললাম- Alhamdulillah, My Dear Sister.

মেয়েটি চলে গেল আমি আর ফাতেমা ব্যস্ত হয়ে পড়ি আকাশেল রক্তিম নিলীমার সাথে।

কুরআন আল্লাহর নাকি মুহাম্মদ (সাঃ) এর বানানো?

কলেজে মাঠের শেষ কোনে বড় লিচু গাছটির নিচে বসে আছি। সাথে আছে বেশ কয়েকজন বান্ধুবী। আমরা একই ক্লাসে পড়ি। আমি ইসমাত। আমার সবচেয়ে কাছের বান্ধবী হলো জারা। ওকে কিছু বলার আগেই ও আমাকে বুঝে ফেলে। এই বিষয়টি আমার কাছে খুব স্পেশাল। কথার মাঝে আমাদের মধ্যে মেডিকেল কলেজের তৃতীয় বর্ষের জেসিকা আপু এসে বসেন। উনাকে আমার একটুও পছন্দ না কারণ, মেয়েদেরকে ইসলাম থেকে দূরে সরিয়ে দেওয়ার কাজে সারাক্ষণ লেগে থাকে।

- আমাকে বললো, কি খবর তোমার ইসমাত?

- এই তো আপু আলহামদুলিল্লাহ ভালো! আপনি কেমন আছেন?

- ভালোই আছি। তোমার বাবা সুস্থ হয়েছেন?

- আছেন আলহামদুলিল্লাহ।

- আলহামদুলিল্লাহ বলছো তুমি! শুনলাম উনি তো ভীষণ অসুস্থ! আমি মনে মনে বললাম, উনার শুরু হয়েছে কথায় কথায় ইসলাম নিয়ে খোঁচা মারা। উনি জন্মসূত্রে মুসলিম হলেও এখন নাস্তিক। কলেজে নাস্তিকদের একটা গ্রুপ আছে যারা প্রতিনিয়ত সকলের ব্রেইন ওয়াশে লেগে থাকে। উনি সেই গ্রুপের স্বীকার হয়েছেন।

- আমি উনাকে বললাম, অসুস্থতাও আল্লাহ তা-আলার একটি বড় নেয়ামত। অসুস্থতা যেমন আল্লাহ দিয়েছেন সুস্থতাও যে কোন উসিলায় তিনিই দিবেন। আল্লাহ তা-আলা কুরআনুল কারীমে বলেন, ان الله مع الصابرين (নিশ্চয়ই ধৈর্য্যশীলদের সাথে আল্লাহ আছেন)। তাই আমাদের প্রত্যেকটি কাজে ধৈর্য্য ধরা উচিত।

- আমার কথায় তিনি কট্টর হেঁসে বললেন, তুমি আল কুরআনে বিশ্বাস করো?

- হুম অবশ্যই করি।

- আমিও একসময় তোমার মতো বিশ্বাস করতাম কিন্তু এখন আমার চোখ খুলে গিয়েছে। ইতিহাসের দিকে চোখ দিলেই বুঝা যায় আল কুরআন একজন রাখাল বালক মুহাম্মাদ সকলের সামনে প্রকাশ করেছে। সে ছিলো একান্তই নিরক্ষর লোক। পড়াশোনা কিছুই জানতো না। পরবর্তীতে মানুষের কাছে খ্যাতি অর্জনের জন্য বিভিন্ন জনের পরামর্শে এমন একটি কিতাব সকলের সামনে নিয়ে হাজির হয়।

কথাগুলো শুনে ভীষণ রাগ উঠছে। পায়ের রক্তগুলো কিলবিল করতে করতে মাথায় উঠে গেছে। প্রিয় নবী'কে নিয়ে এমন কথা শুনতে খারাপ লাগছে। কিন্তু

নিজেকে সামলে নিয়ে তার কথাগুলো শুনছি। ইসলাম শান্তির ধর্ম। এখানে কোন জোরাজোরি নেই। ইসলামে দ্বীনের দাওয়াত সর্বদা ধৈর্য্য এবং সুন্দর আচরণের সাথে দেওয়া রাসূলের সুন্নাত।

- আমি বললাম, আপনি ইতিহাস জানেন?

- হুম অবশ্যই জানি।

- তাহলে ইতিহাসে বলা ফেরাউন সম্পর্কে জানেন?

- হুম জানি। এটির সাথে ফেরাউনের কি সম্পর্ক!

- তেমন কিছু না শুধু ইতিহাস সম্পর্কে বলছি। শুনেন, ১৮৮১ সালে মূসা (আঃ) এর যুগের তৎকালীন বাদশা দ্বিতীয় রামেসিস মতান্তরে প্রথম (ফেরাউন) এর লাশ (মমি) মিশরের এক নদীর উপত্যকায় (পাহাড়ের মাঝখানে যেখান দিয়ে নদী প্রবাহিত হয়) পাওয়া যায়। এটিকে মিশরের জাদুঘরে রাখা হয়। কয়েক বছর পর এটিকে প্রত্নতাত্ত্বিক গবেষণার জন্য ফ্রান্সে পাঠানো হয়। সেই মমি নিয়ে কয়েকজন বিজ্ঞানীই গবেষণা করেন তার মধ্যে একজন ছিলো ফ্রান্সের এক খ্রিস্টান বিজ্ঞানী ড. মরিস বুকাইলি। এটি কি আপনি জানেন?

- হুম অবশ্যই জানি! ইতিহাস না জানার কি আছে! ইতিহাসকে মিথ্যা বলা যায় না।

- আচ্ছা, তাহলে বলুন তো, গবেষণায় তাঁরা কি পেয়েছিল?

- গবেষণায় দেখা গেছে, লাশটির বয়স ৩১১৬ মতান্তরে ৩০০০। আশ্চর্যজনকভাবে লাশটি ছিলো পচনহীন এবং নিরাপদ। লাশটির (মমি) শরীরে ছিলো লবণের স্তূপ। আরো ছিলো হাতে পায়ে কিছু আঘাতের চিহ্ন যা মূলত বড় ঢেউয়ের আঘাতে হয়ে থাকে।'

- আচ্ছা। আপনি কি জানেন এই বিষয়টি পবিত্র ধর্মগ্রন্থ আল কুরআনে ১৪০০ বছর আগে বলা হয়েছে?

- ক্লিয়ার ভাবে বলো!

মুসলিমদের ধর্মগ্রন্থ পবিত্র আল কুরআনে এই বিষয়টি ১৪০০ বছর আগেই বলা হয়েছে। আল্লাহ তা-আলা পবিত্র কুরআনুল কারীমে বলেন- আর আমি বানী ইসরাঈলকে সমুদ্র পার করে দিলাম, অতঃপর, ফিরা'আউন তার সৈন্যদলসহ তাদের পশ্চাদানুসরণ করল যুলুম ও নির্যাতনের উদ্দেশ্য; এমনকি যখন সে নিমজ্জিত হতে লাগল তখন বলতে লাগল, 'আমি ঈমান এনেছি বানী ইসরাঈল যাঁর উপর ঈমান এনেছে, তিনি ছাড়া অন্য মা'বূদ নেই এবং আমি মুসলিমদের অন্তর্ভুক্ত হচ্ছি'। *(সূরা ইউনুস: ৯০)* এর এক আয়াত পরেই আল্লাহ বলেন- 'এতএব, আমি আজ তোমার লাশকে উদ্ধার করব, যেন তুমি তোমার পরবর্তী লোকদের জন্য উপদেশ গ্রহণের উপকরণ হয়ে থাক; আর প্রকৃত পক্ষে

অনেক লোক আমার উপদেশবলী হতে উদাসীন রয়েছে'। *(সূরা ইউনুস: ৯২)।* যেটা আজকের বিজ্ঞান আবিষ্কার করেছে সেটা মুহাম্মাদ (সা) ১৪০০ বছর আগেই বলে গেছেন। আর এই বিষয়টিই ড. মরিস বুকাইলি তাওরাত, বাইবেল এবং আল কুরআন থেকে গবেষণা করে ফেরাউনের লাশ সংগ্রহের বিষয়ে কুরআনে প্রমাণ পায়। পরবর্তীতে আল কুরআনের সত্যতায় তিনি ইসলাম গ্রহণ করেন।

- এবার বলুন, মুহাম্মাদ (সঃ) এর জন্মেরও অনেক পূর্বের ঘটনা, কোন গবেষণা বা কোন বিজ্ঞান ছাড়াই কিভাবে তিনি নির্ভুল এবং স্পষ্ট ভাবে বলতে পারেলেন?

- জেসিকা আপু কিছু সময় চুপ করে বললেন- 'একটা সত্য প্রমাণ করে তো পুরো কিতাবটিকে সত্য বলা যায় না'!

- 'শুধু একটি নয় হাজারটি উদাহরণ রয়েছে যা আল কুরআনের সত্যতা প্রমাণ করে। পৃথিবী সৃষ্টির রহস্য, স্ত্রী মৌমাছির শ্রম এবং তাদের সম্পর্কে তথ্য, উর্ধ্ব জগতের সময় এবং পৃথিবীর সময় সম্পর্কে ইত্যাদি। ধর্মগ্রন্থের সাথে কখনও বিজ্ঞানকে কমপেয়ার করা যাবে না কারণ, বিজ্ঞান পরিবর্তনশীল আবার কখনো ভুলও। কিন্তু আল কুরআন আসমানি গ্রন্থ, এটি অপরিবর্তনশীল এবং নির্ভুল। ঠিক ১৪০০ বছর আগে যেমন ছিলো এখনও এমনি রয়েছে আর কেয়ামত পর্যন্ত এমনই থাকবে। বিন্দুমাত্রও পরিবর্তন হবে না। সত্যতা প্রমাণের জন্য আপনাকে কিছু নিদর্শন বললাম।

- জারা আমাকে টিপ্পুনি কাটছে। বৈঠকে সকলের মুখে মুচকি হাসি।

- আমি ওনাকে বললাম- 'এবারও কি বলবেন, আল কুরআন মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের মিথ্যা বানোয়াট গ্রন্থ'?!

উনি কিছু না বলে মুখটাকে গোমরা করে উঠে চলে গেলেন। নাস্তিকদের বুঝি এই এ স্বভাব, বিস্তারিত বুঝিয়ে বলার পরও তারা কখনও বুঝতে চায় না। যদি দেখে শেষ পর্যন্ত তারা হেরেই গেছে, তবে রেগে মুখটাকে পোমা মাছের মতো করে চলে যায়।

- এখন জেসিকা আপুও তাই করলেন।

- জারা আমাকে গলায় জড়িয়ে বললো, We are proud to have a sister like you.

আল্লাহ তাআলা সকলকে সঠিক পথ দান করুন এবং দ্বীনের পথে চলা সহজ করুন। আমিন ইয়া রব।

ইসলাম নারীকে সম্মান দিয়েছে নাকি বন্দি করেছে?

বারান্দায় বসে আছি। বিকেল ঘনিয়ে এসেছে। সূর্যের তাপমাত্রা অনেক বেশি। এর মাঝেও বাহিরে লুকিয়ে আছে এক অপরূপ সৌন্দর্য। কিছু সময়েই জারা মেয়েটিকে নিয়ে চলে এসেছে। মেয়েটি আমার কাছে ইসলামের এক বিষয়ে জানতে চায়।

- জারা এসে সালাম দিয়ে বলল, কেমন আছিস ইসমাত?

- আলহামদুলিল্লাহ ভালো। তুই কেমন আছিস? আসতে কোন সমস্যা হয়নি তো! '

- না, আলহামদুলিল্লাহ সব ঠিক আছে।

- আমি গিয়ে ফ্রিজে বানিয়ে রাখা শরবতগুলো নিয়ে আসলাম। সাথে থাকা মেয়েটির সাথে পরিচয়ের পর্ব চুকিয়ে কথা শুরু করলাম।

- মেয়েটি বললো, আমি আপনার কাছ থেকে একটি বিষয় জানতে চাই।

- জ্বী বলুন।

- ইসলাম নারীদের বন্দি করেছে, এক ঘরে বানিয়েছে; পুরুষদের করেছে সম্মানিত। তবুও বলা হয় ইসলাম নাকি নারীদেরকে ন্যায্য অধিকার দিয়েছে। সম্মানিতা বানিয়েছে। এটি কিভাবে বলুন?

- আপনার এই প্রশ্নে আমি আপনাকে প্রথমে বিভিন্ন ধর্ম এবং দেশের নারীদের মূল্যয়ণ দেখাবো। তারপর ইসলামেরটা বলবো।

মিথ্যা না জানলে যেমন সত্যকে উপলব্ধি করা যায় না তেমন ভাবে বিভিন্ন ধর্মে নারীদের শোচনীয় অবস্থা না জানলেও আপনি ইসলামে নারীর সৌন্দর্য এবং মাধুর্য উপলব্ধি করতে পারবেন না। প্রাচীন গ্রীস সভ্যতায়- সমাজের ক্রমবিকাশে নারীদের কোন হাত ছিলো না। নারীদের মূল্যহীন দ্রব্যের মতো অন্ধকার কুঠুরিতে বন্দি করে রাখা হতো। বড়-বড় গ্রিক দার্শনিক এবং চিন্তাবিদরাও মনে করতেন, নারীর অস্তিত্বের মতো নারী নামটিকেও যেন বদ্ধ ঘরে আবদ্ধ করে রাখা হয়। *(গ্রিক ইতিহাস, পৃ. ১১৪-১১৭)* প্রখ্যাত গ্রিক চিন্তাবিদ ডেমোস্তিন বলেন, "আমরা যৌন তৃপ্তি অর্জনের জন্য বেশ্যালয়ে যাই এবং আমাদের দৈনন্দিন কর্মসূচি তৈরি করে থাকে বালিকা বন্ধুরাই আর আমরা কেবল আইনগতভাবে সন্তান উৎপাদনের জন্যই স্ত্রী গ্রহণ করি"। রোমান সভ্যতায় নারী- রোমান সভ্যতায় নারী হয়ে জন্ম নেওয়াই ছিলো সবচাইতে বড় অযোগ্যতা। নারীদের গুরুত্ব, মর্যাদা কিছুই ছিলো না। আইনগত কোন অধিকার ও ছিলো না। কোন বিষয়ে নারীরা অধিকার, অভিযোগ বা বিচার চাওয়া থেকেও ছিলো বঞ্চিত। তাঁদের সাক্ষ্যের ও কোন মূল্য ছিলো না। ছিলো না পৈতৃক কোন

সম্পত্তি। পিতার থেকে পাওয়া যে কিছুই বিবাহের সাথে সাথে স্বামীর অধীনে চলে যেত। সে সময় 'সর্দার বিয়ে' নামক এক প্রথা ছিলো; যখন তাদের সর্দার চাইতো যে কোন নারীকে বিবাহ করতে পারতো এবং বিয়ের পর কোন অভিযোগ করলে সর্দার তাকে মৃত্যুদণ্ড ও দিতো পারতো। কোন মহিলা বিধবা হওয়ার পর তার ছেলেদের অধিনে চলে যেত আর ছেলে না থাকলে স্বামীর ছোট ভাই বা চাচার অধীনে চলে যেত। হিন্দু ধর্মে নারী; প্রাচীন ভারতের ইতিহাসে মনু স্মৃতির অধ্যায়নে জানা যায়, মনু যখন নারী সৃষ্টি করেছিল তখন সে নারীকে পুরুষের প্রতি প্রেম, রূপচর্চা, যৌন ব্যভিচারে লিপ্ত থাকা এবং রোধের প্রবণতা দানকারীনি রূপে সৃষ্টি করে এবং মানবিক মর্যাদা থেকে বঞ্চিত করে নারীকে নিকৃষ্টতম ব্যবহারের উপযুক্ত বলে ঘোষণা করে।

সুতরাং, হিন্দু সমাজে এই ধারণা প্রসিদ্ধ লাভ করে, নারী হচ্ছে নোংরামির মূল এবং তার অস্তিত্ব হচ্ছে পুরোপুরি নরক। *(বিশ্ব ইতিহাস, পৃষ্ঠা. ৩৯৪, সূত্র. আলবাহী আল খাওলী, ইসলামে নারী, পৃষ্ঠা. ১৭)*

প্রাচীন হিন্দু সমাজে সতীদাহ প্রথা ছিল। স্বামী মৃত্যুবরণ করলে স্ত্রীকেও জীবন্ত আগুনে স্বামীর সাথে জ্বলে পুড়ে মরতে হতো পরবর্তীতে ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগরের প্রচেষ্টায় তা রোহিত হয়েছে। ইহুদি ধর্মে; একদল নারীদের ভাইদের মত অধিকার দিতে ও মর্যাদা দিতে সম্মত ছিল না। নারীদেরকে ভাইদের মতো পৈতৃক সম্পত্তি দেওয়া হতো না এবং তাদের মান ছিল একজন সেবিকার মত।পিতারা চাইলে তাদের বিক্রিও করে দিতে পারতো। খ্রিষ্ট ধর্মে; পান্ডিতদের মতে, "নারী হচ্ছে শয়তানের সন্তান"। তারা আরো বলেছে, "নারীদের উপর অভিশাপ করা অপরিহার্য, কারণ বিপথগামীতার আসল পথ তারাই"। তারা মনে করত, নারীরা কি পুরুষদের মতো উপাসনা করতে পারবে? তারা কি স্বর্গে যেতে পারবে? তাদের মধ্যে কি মানবিক আত্মা আছে? আরো অনেক অবমাননা তাদের মাঝে ছিলো। বৌদ্ধ ধর্মে; নারীদের অবস্থা ছিল অত্যন্ত হীন ও তুচ্ছ। বুদ্ধদেব স্বয়ং স্ত্রী, পুত্র, সংসার পরিত্যাগ করে সন্ন্যাসী জীবন-যাপন করতেন। নারীদেরকে তিনি মোহের বাস্তব স্বরপ এবং মানবাত্মার নির্বাণ লাভে বিঘ্ন বলে মনে করতেন।

কথাগুলো মেয়েটি মনযোগ দিয়ে শুনছে। বাহিরটা অন্ধকার ঢেকে নিয়েছে। আকাশে গর্জন শুরু হয়েছে। কিছুক্ষণেই হয়তো বৃষ্টি নামবে। ময়নাকে ডেকে তিন কাপ চায়ের কথা বলে, আমি আবার বলা শুরু করলাম- ইসলামের আগের যুগ আইয়ামে জাহেলিয়াতে নারীদের অবস্থা ছিল খুবই শোচনীয়। তাদের কোন মূল্য ছিল না। তারা সমাজে পণ্যের মতো ব্যবহৃত হতো। নারীদেরকে গর্ভের কলঙ্ক মনে করা হতো এবং তারা সমাজে লজ্জার ভয়ে জীবন্ত কন্যা সন্তানকে

দাফন করে দিত। জাহেলিয়াতে নারীদের ভয়াবহতা নিয়ে আল্লাহ তাআলা কুরানুল কারীমে বলেন, "আর যখন তাদের কাউকে কন্যা সন্তানের সুসংবাদ দেওয়া হত, তখন তার চেহারা কালো হয়ে যায়, আর সে থাকে দুঃখ ভারাক্রান্ত। তাকে যে সংবাদ দেওয়া হয়েছে সে দুঃখে সে কওম থেকে আত্মগোপন করে। অপমান সত্ত্বেও কি একে রেখে দেবে, না মাটিতে পুঁতে ফেলবে? জেনে রাখ, তারা যা ফয়সালা করে তা কতই না মন্দ"! *(সূরা নাহল: ৫৮-৫৯)* ।

এবার চলুন দেখি, ইসলাম নারীদেরকে কতটুকু সম্মান এবং মর্যাদা দিয়েছে। নারীদেরকে নিয়ে পবিত্র কুরআনুল কারীমে আল্লাহ তা-আলা বলেন, "হে বিশ্বাসীরা! তোমরা নারীদের সাথে উত্তম আচরণ কর, যদি তাদের প্রতি কোনো অসন্তুষ্টি থাকে, তবে মনে রেখো, আল্লাহ চাইলে তাদের মধ্যে অনেক ভালো কিছু থাকতে পারে"। *(সূরা নিসা: ১৯)*। অন্য আয়াতে বলা হয়েছে, "পুরুষদের জন্য মাতা-পিতা ও নিকট আত্মীয়রা যা রেখে গিয়েছে তা থেকে একটি অংশ রয়েছে। আর নারীদের জন্য রয়েছে মাতা-পিতা ও নিকট আত্মীয়রা যা রেখে গিয়েছে তা থেকে একটি অংশ, তা কম হোক বা বেশি হোক, নির্ধারিত হারে"। *[সূরা নিসা:৭]*

অন্যত্রে বলেছেন, "যে মুমিন অবস্থায় নেক আমল করবে, পুরুষ হোক বা নারী, আমরা তাকে পবিত্র জীবন দান করব এবং তারা যা করত তার তুলনায় অবশ্যই আমরা তাদেরকে উত্তম প্রতিদান দেব।" *(সূরা নাহল: ৯৭)* "আর তাদের (নারীদের) সাথে সদ্ভাবে আচরণ কর"। *(সূরা নিসা: ১৯)*

নবী কারীম (সঃ) ইরশাদ করেছেন, "তোমাদের মধ্যে উত্তম পুরুষ সে, যে তার স্ত্রীর প্রতি উত্তম আচরণ করে"। *(তিরমিজি ৩৬১৩)।*

অন্য হাদিসে এসেছে, "নারী তার স্বামীর ঘরে জিম্মাদার এবং তার জিম্মাদারি সম্পর্কে তাকে জিজ্ঞাসা করা হবে"। *(সহীহ বুখারী: ৮৫৩)*

বোন, যেখানে বিভিন্ন ধর্মে নারীদের মর্যাদা এতটা নিষ্ঠুর এবং নির্মম সেখানে ইসলাম নারীকে দিয়েছে সম্মান এবং মর্যাদা। নারীর প্রতি উত্তম আচরণ, নারীর পৈতৃক সম্পত্তি এবং অধিকার। শিক্ষা-দীক্ষা কোন দিক দিয়ে ইসলাম নারীদের সাথে বৈষম্য করেনি। ইসলামে নারীর মর্যাদাকে উপলব্ধি করতে আমরা আরো কিছু উদাহরণ দেখতে পারি, হযরত খাদিজা (রাঃ)- যিনি দুনিয়াতে থাকাকালীন আল্লাহ তায়ালার পক্ষ থেকে জান্নাতের সুসংবাদ পেয়েছিলেন। হযরত ফাতেমা (রাঃ)- যিনি জান্নাতে সকল নারীর সর্দারিনী হবেন। দুনিয়াতে আল্লাহ তায়ালা নারীকে ঘরের রাণী বানিয়েছেন। বানিয়েছেন রহমত ও বরকত। মায়ের মর্যাদা বুঝাতে বলা হয়েছে, "মায়ের পদতলে রয়েছে সন্তানের বেহেস্ত"।

- এত কিছুর পরও আপনি কিভাবে দাবি করবেন ইসলাম নারীকে

ন্যায্য অধিকার দেয়নি?

- মেয়েটি খুব কৌতুহল নিয়ে বলল, "আমি মেনে নিয়েছি ইসলাম নারীদের সম্মানিতা বানিয়েছে কিন্তু প্রচন্ড গরমে বোরখা হিজাবে মুড়িয়ে থাকা, ঘরের মধ্যে লুকিয়ে থাকা এটা কেমন প্রশান্তি"?

- বোন সুন্দর বলেছেন, বোরখা হিজাবের কথায় গেলে আমি বলবো, এটি নারীদের নিরাপত্তার জন্যই করা হয়েছে।

একজন নারী যখন রাস্তা-ঘাটে চালাফেরা করে তখন বহু লোকের নজরে পরে। যদি সে আবৃত না থাকে তাহলে কুদৃষ্টির স্বীকার হয়। তারপর, ধর্ষণ, পরকীয়া আরো অনেক কিছুই! এগুলো থেকে বেঁচে থাকার জন্যই ইসলাম নারীকে নন-মাহরাম থেকে নিজের সৌন্দর্য লুকিয়ে রাখার আদেশ দিয়েছে। নারীদেরকে পুরুষের সমতুল্য হয়ে বাহিরে যেতে নিষেধ করা হয়েছে কারণ, আল্লাহ তাআলা একেক জনকে একেক ধরনের দক্ষতা এবং সক্ষমতা দিয়ে দুনিয়াতে প্রেরণ করেছেন। নারীকে করেছেন ঘরের রাণী আর পুরুষকে বাহিরের রাজা। পুরুষ চাকরি করে। মাঠে ধান কাটে। মাটি কাটে। সমুদ্রে-জলাশয়ে কাজ করে। ইত্যাদি, ইত্যাদি। যদি নারীরা সমতাই চায় তাহলে, তাদের ও সামানভাবে সেই কাজগুলো ও করতে হবে। তবে, ঘরের নিরাপত্তা, সন্তান লালন-পালন এবং তার মাতৃত্বের শোভা কোথায় থাকে! নারীদের প্রকৃত সৌন্দর্যই তো বিলীন হয়ে যায়। আর রব প্রদও আমাদের এই সৌন্দর্য এবং অধিকারকে ধ্বংস করার জন্যই পশ্চিমা সংস্কৃতির এজেন্টরা "নারী অধিকার" নামে আমাদের বোনদের মাঠে নামিয়েছে। অশ্লীলতা এবং বেহায়াপনায় জড়িয়েছে।

- পরিশেষে আপনাকে বলবো, ইসলাম নারীকে বন্দী করেনি; ইসলাম নারীকে ঘরের রাণী বানিয়েছে। বানিয়েছে একটি সুভাসিত ফুল।

- মেয়েটি আমাকে বলল, "আপু; আমার কলেজে কিছু খ্রিস্টান বান্ধুবী আছে তারাই মূলত এভাবে আমাকে প্রশ্নগুলো করে বিভ্রান্ত করার চেষ্টা করে। আপনার কাছ থেকে বুঝে নিলাম। দোয়া করি আল্লাহ তা-আলা যেন আপনার মতো ইসমাত প্রত্যেকটি ঘরে ঘরে কবুল করেন। আপনাকে উত্তম প্রতিদান দান করেন। আমিন।

- জারা বলল, "শুকরিয়া প্রিয় বোন। ছুম্মা আমিন"।

আমিও মনে মনে মহান রবের দরবারে শুকরিয়া আদায় করলাম। বাহিরে মূষলধারে বৃষ্টি বইছে। চায়ের কাপে চুমুক দিয়ে বাহিরে বৃষ্টির দিকে তাকিয়ে আছি। কি সুন্দর দৃশ্য! মন বলছে, না জানি জান্নাতের নহরগুলো কত সুন্দর......

লেখক পরিচিতি পড়তে কিউআর কোডটি স্ক্যান করুন

মিজানুর

লেখক- বি এম মিজানুর রহমান এর- ১টি প্রবন্ধ

আমার বিশ্বাস

এই সুন্দর ধরণীর বুকে কতো মনোরম দৃশ্য। শত সহস্র উদ্ভিদ এবং প্রাণীকূল। জীবন রয়েছে এমন সবাইকে জীব বলা হয়। নেহাৎ পৃথিবীতে জড়বস্তুর সংখ্যা অনেক বেশি তথাপি জীব সর্বত্র তার জীবন আছে বলে পৃথিবীর সকল সুখ ভোগ করতে পারছে। পারছে চলতে, দেখতে এবং সর্বাপরি তার বংশধারা টিকিয়ে রাখতে। অনেক অনেক দৈহিক আকৃতি, গঠন এমনকি বর্ণের ভিন্নতা রয়েছে সকল জীবগুলোর মধ্যে।মানুষ সকল জীবের মধ্যে উন্নত মস্তিষ্কের কারণে সেরা জীব হিসেবে বাস্তুতন্ত্রে রাজত্ব করছে। কিন্তু শুধুমাত্র দৃষ্টিভঙ্গি আর বিশ্বাসের কারণে ভিন্নতা সৃষ্টি হয়েছে সৃষ্টির সেরা মানবকূলের মাঝে। আমার দৃষ্টিতে পৃথিবীর মানুষের গড নিয়ে দৃষ্টিভঙ্গি তিন রকমের। সেগুলো হলো-

১. একেশ্বরবাদ দৃষ্টিভঙ্গিঃ পৃথিবীতে এই বিশ্বাসী মানুষের সংখ্যা সর্বাধিক। এই বিশ্বাসী মানুষেরা মনে করে শুধুমাত্র একজন স্রষ্টা রয়েছেন এবং তিনিই একমাত্র উপাসনারযোগ্য। তিনি আল্লাহ, ভগমান, গড, ঈশ্বর, রব প্রভৃতি নামে বিশ্বাসী মানুষের অন্তরে বসবাস করেন। স্রষ্টার ভয়ে অনৈতিক আর অসৎ কর্ম থেকে এই বিশ্বাসী লোকেরা বেঁচে থাকেন এবং এক স্রষ্টার উপর বিশ্বাস করে ইহকালীন ও পরকালীন শান্তি সুখের সন্ধান করে থাকেন। এই বিশ্বাসী লোকজনকে আস্তিক বলা হয়।

২. বহুঈশ্বরবাদঃ পৃথিবীতে এই দৃষ্টিভঙ্গি ও বিশ্বাসের মানুষ নেহাৎ কম নয়। বহু দেব-দেবতা এবং নানান শক্তিকে তারা গড হিসেবে উপাসনা করেন। এই বিশ্বাসী লোকেরা বিপদে আপদে বহুঈশ্বরকে প্রার্থনা করে জাগতিক মঙ্গল প্রত্যাশা করে থাকেন। এই বিশ্বাসী লোকজনও আস্তিকের আওতাভুক্ত তবে ক্ষেত্রবিশেষ এই বিশ্বাসীরা নাস্তিক হয়ে থাকেন।

৩. নাস্তিকঃ পৃথিবীতে এই বিশ্বাসী লোকেরা স্রষ্টার অস্তিত্ব অস্বীকার করেন এবং গড ডিবেট সৃষ্টি করেন। সৃষ্টির শুরু থেকে চলে আসা স্রষ্টার প্রতি বিশ্বাস এবং বিভিন্ন আচার অনুষ্ঠান পালনে এই বিশ্বাসী মানুষ অনিচ্ছুক। এরা

প্রকৃতির সকল কিছু ব্যখ্যা করার জন্য যুক্তি এবং বৈজ্ঞানিক তত্বের দারস্থ হতে ভালোবাসেন।

আমার বিশ্বাস আমার একান্ত নিজের। ছোট্টবেলা থেকে একটি ধর্মীয় পরিবেশে বেড়ে ওঠা এবং নানান আচার অনুষ্ঠান পালন করে অভ্যস্ত হওয়ার পর বিশ্ববিদ্যালয়ের গন্ডিতেই পরিচয় ঘটে তিন শ্রেণীর মানুষের সুচিন্তিত মতামত, যুক্তি এবং তর্কের সঙ্গী হওয়ার। স্যার বার্টান্ড রাসেল, হুমায়ুন আজাদ, আরজ আলি মাতবরসহ নাস্তিকদের যুক্তি আমার কাছে ঠুনকো লাগে। এই মনোরমা পৃথিবীর সৃষ্টি নিশ্চয়ই কোন স্রষ্টা করেছেন। আমাদের এতো সুন্দর দৈহিক অবয়ব নিশ্চিত কোন সূ-নিপূন কারিগর সৃষ্টি করেছেন। তিনিই আমাদের গড। তাই আমি আস্তিকদের দলে। আমার দলের সকল মানুষের মতো আমি কিন্তু বহুশক্তিতে বিশ্বাসী নয়। অর্থাৎ বহুঈশ্বর পুজা আমার অপছন্দ। ঈশ্বর বিভিন্ন রূপে বিরাজ করতে পারেন তবে তিনি এক এবং অদ্বিতীয়। তিনি কোন শরীক সৃষ্টি করেননি। তাই বহুঈশ্বর চিন্তা আমার কাছে যুক্তিতর্কে টিকে না। আমার অগাধ বিশ্বাস এক ঈশ্বরে, যিনি আমাদের সকল কিছু নিয়ন্ত্রণ করেন এবং সমগ্র বিশ্বপ্রকৃতি এক ইশারায় তিনি চালিত করেন। আমার বিশ্বাসে গড ডিবেটের সর্বশেষ এবং সুচিন্তিত যুক্তি হলো সৃষ্টি জগতের নিয়ম শৃঙ্খলা- যা কিভাবে নিয়ন্ত্রিত হচ্ছে? কে করছেন এতো সব বর্নীল আয়োজন? সৃষ্টিজগতের এমন জটিলতা এবং সৌন্দর্য আমাকে এক রবের অস্তিত্বের প্রতি মাথা নোয়াতে বাধ্য করে। পবিত্র ধর্মগ্রন্থ আল কোরআনের ব্যাখ্যা আল্লাহ এক এবং অদ্বিতীয়, তাঁর কোন অংশীদার নেই- আমি মনেপ্রাণে বিশ্বাস করি। আমাকে কেটে টুকরো টুকরো করে ফেললেও প্রতিটি খন্ড তার অস্তিত্ব ঘোষণা করবে অবলীলায়। স্রষ্টা আছেন এবং সৃষ্টির সকল কিছু তার অস্তিত্বের বাস্তব প্রামাণ্য দলিল হিসেবে জ্ঞানী লোকের মস্তিষ্কে অনুরণন সৃষ্টি করে।

লেখক পরিচিতি পড়তে কিউআর কোডটি স্ক্যান করুন

রবিন

লেখক- ওমর ফারুক রবিন -এর ২টি প্রবন্ধ

আল্লাহ এবং ইসলাম

আল্লাহ এক— এই জাগতিক মহাবিশ্বে তিনি ছাড়া আর কোনো ইলাহ নেই। আমরা তারই প্রার্থনা করি। তিনি আমাদের সৃষ্টিকর্তা, পালনকর্তা, রিজিকদাতা, বিচার দিবসের মালিক। এই পৃথিবীর সকল কিছু তারই ইশারায় চলে। পৃথিবীতে যতো মহাগ্রন্থের নাম রয়েছে তারমাঝে "আল-কোরআনই" শ্রেষ্ঠ। আল্লাহ- যার নামেই হৃদয়ে আসে প্রশান্তি। পড়! তোমার প্রতিপালক আল্লাহর নামে। যিনি মানুষকে সৃষ্টি করেছেন নিষিক্ত ডিম্বক থেকে। পড়! সেই মহান দয়ালু আল্লাহর নামে।

যিনি মানুষকে জ্ঞান দিয়েছেন কলমের, আর মানুষকে শিখিয়েছেন যা সে কখনোই জানতোনা। *(সূরা আলাক)*

আল্লাহ- তিনি ব্যতিত কোনো উপাস্য নেই। তিনি স্বাধীন এবং নিত্য নতুন সবকিছুর ধারক। তন্দ্রা ও নিদ্রা তাকে স্পর্শ করতে পারেনা। নভোমণ্ডল ও ভূমন্ডলে যা কিছু রয়েছে সবই তার। কে আছে এমন যে তার অনুমতি ব্যতিত তার নিকট সুপারিশ করতে পরে! সম্মুখের অথবা পশ্চাতের সবই তিনি অবগত আছেন। একমাত্র তিনি যতটুকু ইচ্ছে করেন তা ব্যতিত তার জ্ঞানের কিছুই তারা আয়ত্ত করতে পারেনা। তার আসন - আসমান ও যমীন ব্যাপি হয়ে আছে এবং এত দু-ভয়ের সংরক্ষণে তাকে বিব্রত হতে হয়না। তিনিই সর্বোচ্চ মহামহিয়ান। *(আয়াতুল কুরসী)*

আল্লাহর প্রতি বিশ্বাসঃ আল্লাহর প্রতি বিশ্বাসের অর্থ হলো অন্তর দিয়ে আল্লাহর উপর এই দৃঢ় বিশ্বাস পোষণ করা যে, তিনিই এই আসমান এবং জমিনের সব কিছুর মালিক। আমরা অদৃশ্যে বিশ্বাস করি, আল্লাহকে আমরা দেখিনি, তবুও আল্লাহ আছেন এবং তিনিই আমাদের সৃষ্টিকর্তা এটা আমরা জানি, মানি, তার হুকুম পালন করি এবং তারই প্রার্থনা করি। আল্লাহর দেয়া এই পৃথিবীতে বিভিন্ন ধর্মের মানুষ বসবাস করে। পরিসংখ্যান অনুযায়ী বিশ্বে মোট ধর্মের সংখ্যা ৪,৩০০। সাধারণভাবে, চারটি প্রধান ধর্ম হলো ইসলাম ধর্ম, খ্রিস্ট ধর্ম, হিন্দু ধর্ম এবং বৌদ্ধ ধর্ম। আমাদের ধর্ম হলো ইসলাম। ইসলাম হলো পরম শান্তির ধর্ম। ইসলামে আল্লাহকে আমরা "আল্লাহ" বলে থাকি এবং মুহাম্মদ (সাঃ) কে আল্লাহর প্রেরিত সর্বশেষ নবী এবং রাসূল হিসেবে মান্য করি। ইসলামের মূল

ভিত্তি হলো আল-কোরআন, যা আল্লাহর বাণী এবং সুন্নাহ, যা নবী মুহাম্মদ (সাঃ) এর জীবন ও কর্মের আদর্শ। ইসলামে পাঁচটি স্তম্ভের উপর ভিত্তি করে জীবন পরিচালিত হয়। শাহাদা (কালেমা), সালাত (নামাজ), সাওম (রোযা), হজ্ব এবং যাকাত। ইসলাম শান্তি, সাম্য, মানবিকতা, ন্যায়বিচার, এবং পরোপকারের শিক্ষা দেয়। ইসলাম বিশ্বের দ্বিতীয় বৃহত্তম ধর্ম, যার অনুসারীর সংখ্যা প্রায় ২ বিলিয়নের বেশি। ইসলাম মক্কা ও মদিনায় সপ্তম শতাব্দীতে হযরত মুহাম্মদ (সাঃ) এর মাধ্যমে প্রচার শুরু হয়। সর্বপ্রথম আল্লাহর নির্দেশে ইসলাম প্রচার করেন আদি মানব ও সর্বপ্রথম নবী হযরত আদম (আঃ), তারপর থেকে অনেক "আম্বিয়া" বা পয়গম্বর যুগের পর যুগ মানবজাতিকে শিক্ষাদানের জন্য এসেই চলেছেন। শেষ এবং চূড়ান্ত নবী মুহাম্মদ (সাঃ) খ্রিষ্টীয় সপ্তম শতকে তিনি এই ধর্ম পুনঃপ্রচার করেন। পবিত্র আল-কোরআন ইসলাম ধর্মের মূল ধর্মগ্রন্থ। নবী এবং রাসূলগণঃ নবী এবং রাসূলগন হলেন আল্লাহর মনোনীত বান্দা। যারা মানুষের হেদায়েতের জন্য পৃথিবীতে প্রেরিত হয়েছিলেন। হাদিস শরিফে নবী-রাসূলগনের সংখ্যা উল্লেখ নেই তবে অসংখ্য বা অগণিত। তারা আল্লাহর বার্তা ও নির্দেশাবলী মানুষের কাছে পৌঁছে দিতেন এবং তাদের সৎ পথে পরিচালিত করতেন। ইসলাম ধর্মানুসারে 'হযরত আদম (আঃ)' প্রথম মানব এবং প্রথম নবী। সর্বশেষ এবং সর্বশ্রেষ্ঠ নবী হলেন 'হযরত মুহাম্মদ (সাঃ)' নবী এবং রাসূলের মধ্যে কিছু পার্থক্য রয়েছে- সাধারণত নবী হলেন তিনি, যিনি 'আল্লাহর' কাছ থেকে ওহী ঐশী বাণী লাভ করেন। আর রাসুল হলেন; তিনি যিনি ওহী লাভ করার পাশাপাশি নতুন শরিয়াত প্রাপ্ত হন। নবী ও রাসূলগণের উদ্দেশ্য ছিল আল্লাহর পরিচয় তুলে ধরা এবং তার একত্ববাদে মানুষকে আহ্বান করা। আল্লাহর এবাদত ও ধর্মীয় বিধি-বিধান শিক্ষা দেওয়া,

পরকাল সম্পর্কে ধারণা দেয়া মানুষকে সৎ পথে পরিচালিত করা। আল কোরআনে ২৫ জন নবীর নাম উল্লেখ করা হয়েছে, তার মধ্যে- হযরত আদম (আঃ), হযরত দাউদ (আঃ), হযরত নূহ (আঃ), হযরত আইয়ুব (আঃ), হযরত ইব্রাহিম (আঃ), হযরত মূসা (আঃ), হযরত ঈসা (আঃ) এবং হযরত মুহাম্মদ (সাঃ) উল্লেখযোগ্য। ইসলামে ১০৪টি আসমানী কিতাবের কথা উল্লেখ আছে, তবে এ ৪টি বড় কিতাব রয়েছে- তাওরাত, যাবুর, ইঞ্জিল, আল-কোরআন। হযরত মূসা (আঃ) এর উপর যে কিতাব নাজিল হয়েছে তার নাম 'তাওরাত' পবিত্র কুরআনে তার উল্লেখ রয়েছে। বর্ণিত হয়েছে- আমি তাওরাত অবতীর্ণ করেছি যাতে আছে পথ নির্দেশনা ও আলো। আল্লাহর অনুগত নবীরা সে অনুসারে পরিচালনা করত এবং খোদাভীরু ও জ্ঞানী রাও। কারণ তাদের আল্লাহর কিতাব সংরক্ষণের দায়িত্ব দেয়া হয়েছিল এবং এ ব্যাপারে তারা সাক্ষী

ছিল। *(সূরা মায়েদা, আয়াত-৪৪)*
মূসা (আঃ) এর ভাষা ছিল হিব্রু তাই তার উপর নাযিলকৃত কিতাব হিব্রু ভাষায় রাখা হয়। হযরত দাউদ (আঃ) এর উপর 'জাবুর' কিতাব নাজিল করা হয়েছে জাবুরের অর্থ লিপিবদ্ধ।
বনি ইসরাইলের জন্য এই কিতাব দাউদ (আঃ), বিভিন্ন এবং আল্লাহর গুণাবলী মূলক কথার বর্ণনা করেন। 'পবিত্র কোরআনে' এরশাদ হয়েছে নিশ্চয়ই আমি তোমার কাছে ওহি প্রেরণ করেছি, যেমন নূহ ও তার পরবর্তী নবীদের কাছে প্রেরণ করেছিলাম। ইব্রাহিম, ইসমাইল, ইসহাক, ইয়াকুব, তার বংশধর ঈসা, আইয়ুব, ইউনুস, হারুন, সোলায়মান এর কাছে ওহী প্রেরণ করেছিলাম যাবুর দিয়েছিলাম। *(সূরা আন নিসা,আয়াত-১৬৩)*
যাবুর কিতাব কোন ভাষায় নাজিল হয়েছিল তা জানা যায়নি, তবে দাউদ (আঃ) ছিলেন বনি ইসরাইলের নবী। বনি ইসরাইলের জন্য ঈসা (আঃ) এর উপর অবতীর্ণ করেন। আল্লাহ তায়ালা ওয়াও গ্রীক ভাষায় ছিল পবিত্র কুরআনে বর্ণিত হয়েছে আমি তাদের পর তাওরাতের সত্যায়নকারী রূপে মারিয়ামকে প্রেরণ করেছি মুত্তাকীদের জন্য পথ নির্দেশ ও উপদেশ রূপে। তাকে ইঞ্জিল প্রদান করেছি তার পূর্বে অবতীর্ণ তাওরাতের সত্যায়নকারী রূপে যাতে ছিল উপদেশ ও আলো। *(সূরা মায়েদা, আয়াত-৪৬)*
কেয়ামত পর্যন্ত মানুষ ও জিন জাতির হেদায়েতের জন্য সর্বশেষ নবী মুহাম্মদ (সাঃ) এর উপর আরবি ভাষায় তা অবতীর্ণ। নাবিজি (সাঃ) ছিলেন আরবি ভাষী। তাই তার ওপর নাজিলকৃত কোরআন ও আরবি ভাষায় নাজিল করা হয়েছে। পবিত্র কোরআনে মহান আল্লাহ বলেন নিশ্চয়ই আমি একে আরবি কুরআন রুপে নাজিল করেছি যাতে তোমরা বুঝতে পারো। *(সূরা ইব্রাহীম, আয়াত- ২)*
ঈমান– "ঈমান" শব্দটি আরবি শব্দ এবং এর অর্থ হল বিশ্বাস। সাধারণভাবে, এটি আল্লাহর একত্ব এবং তাঁর রাসূলদের প্রতি বিশ্বাস স্থাপন করাকে বোঝায়। ইসলামে ঈমানের গুরুত্ব অপরিসীম। ঈমান একজন ব্যক্তিকে মুসলমান হিসেবে গণ্য করে। এটি বিশ্বাস, কথা ও কাজের সমন্বয়ে গঠিত।
ইসলামে ঈমানকে কয়েকটি ভাগে ভাগ করা যায়– আল্লাহ এক ও অদ্বিতীয়, তাঁর কোন শরীক নেই। আল্লাহ কর্তৃক নিয়োজিত ফেরেশতাদের প্রতি বিশ্বাস স্থাপন করা। আল্লাহ কর্তৃক নাজিলকৃত কিতাবসমূহের প্রতি বিশ্বাস স্থাপন করা। আল্লাহর মনোনীত রাসূলদের প্রতি বিশ্বাস স্থাপন করা। মৃত্যুর পর পুনরুত্থান, বিচার দিবস এবং পরকালের জীবনের প্রতি বিশ্বাস স্থাপন করা। ভালো-মন্দের সবকিছু আল্লাহর পক্ষ থেকে নির্ধারিত, এই ধারণার প্রতি বিশ্বাস স্থাপন করা।

ঈমান মানুষের জীবনে পরিবর্তন আনে এবং তাকে সৎ ও সুন্দর পথে পরিচালিত করে। কোরআনে বর্ণিত বৈজ্ঞানিক বিষয়ঃ কিছু আয়াতে মহাবিশ্বের সৃষ্টি সম্পর্কে এমন ধারণা দেওয়া হয়েছে যা আধুনিক বৈজ্ঞানিক তত্ত্বের সাথে মিলে যায়। কোরআনে পৃথিবীর গঠন এবং এর উপর পর্বতমালা ও সমুদ্রের ভূমিকার কথাও উল্লেখ আছে। কোরআনে বিভিন্ন উদ্ভিদ ও প্রাণী সৃষ্টির প্রক্রিয়া সম্পর্কে ইঙ্গিত দেওয়া হয়েছে, যা আধুনিক জীববিজ্ঞানের সাথে সম্পর্কিত। কোরআনে মানব ভ্রূণের বিকাশের বিভিন্ন স্তর সম্পর্কে বর্ণনা করা হয়েছে, যা আধুনিক ভ্রূণবিদ্যা দ্বারা সমর্থিত। কোরআনে গ্রহ, নক্ষত্র, সূর্য, চন্দ্র এবং তাদের গতিবিধি সম্পর্কে আলোচনা করা হয়েছে। কোরআনে বিভিন্ন প্রাকৃতিক ঘটনাবলী, যেমন- বৃষ্টি, বাতাস, মেঘ, ইত্যাদি সম্পর্কে আলোচনা করা হয়েছে। মাইক্রোস্কোপ আবিষ্কারের পর আজকের বিজ্ঞান প্রমাণ করেছে যে প্রতিটি জীবের কোষের ৯০ শতাংশ পানি দিয়ে গঠিত। অথচ কোরআন ১৪০০ বছর আগেই সে তথ্য আমাদের জানিয়েছে। আল্লাহ তা-আলা ইরশাদ করেছেন— 'এবং প্রাণবন্ত সব কিছু আমি পানি থেকে সৃষ্টি করলাম'। *(সুরা- আল আম্বিয়া, আয়াত : ৩০)*

কোরআন আর বিজ্ঞানের সীমাবদ্ধতাঃ কোরআন একটি ধর্মগ্রন্থ, বিজ্ঞান গ্রন্থ নয়। কিছু আয়াতের বৈজ্ঞানিক ব্যাখ্যা নিয়ে বিতর্ক রয়েছে। কিছু ক্ষেত্রে, কোরআনের ভাষাকে রূপক বা প্রতীকী অর্থে ব্যাখ্যা করা হয়। কোরআনের কিছু বিষয় আধুনিক বিজ্ঞানের দ্বারা এখনও সম্পূর্ণরূপে ব্যাখ্যা করা সম্ভব হয়নি। কোরআনের কিছু বিষয় বিজ্ঞানীদের দ্বারা ভুল প্রমাণিত হয়েছে। বিজ্ঞানের দৃষ্টিতে লোহার আবিষ্কার মাটি থেকে নয়, বরং তা আমদানি করা হয়েছে। বিজ্ঞান এখন প্রমাণ করেছে যে হাজার হাজার বছর আগে মহাকাশ থেকে একটি উল্কাপিণ্ড পৃথিবীতে আঘাত হানে, যার কারণে পৃথিবীতে লোহা ছড়িয়ে পড়ে। অথচ আল্লাহ-তায়ালা কোরআনে বলেছেন- "২৩:--বস্তুত আমি আমার রাসূলগণকে সুস্পষ্ট নিদর্শনাবলীসহ পাঠিয়েছি এবং তাদের সঙ্গে নাযিল করেছি কিতাব ও তুলাদণ্ড"। "২৪:--যাতে মানুষ ন্যায়ের উপর প্রতিষ্ঠিত থাকে এবং আমি অবতীর্ণ করেছি লোহা, যার ভেতর রয়েছে রণশক্তি এবং মানুষের জন্য বহুবিধ কল্যাণ"। "২৫:--এটা এই জন্য যে, আল্লাহ জানতে চান, কে তাকে না দেখে তাঁর (দ্বীনের) ও তাঁর রাসূলগণের সাহায্য করে। নিশ্চয়ই আল্লাহ মহাশক্তিমান ও সর্বময় ক্ষমতার মালিক"। *(সূরা আল হাদীদ - ২৩,২৪,২৫)*

কোরআন ও বিজ্ঞানের সম্পর্ক একটি জটিল বিষয়। কোরআনে কিছু বিষয় এমনভাবে উল্লেখ করা হয়েছে যা আধুনিক বিজ্ঞানের সাথে মিলে যায়, আবার কিছু বিষয়ে বিতর্ক রয়েছে। কোরআনকে বিজ্ঞানসম্মত গ্রন্থ হিসেবে বিবেচনা

করার আগে এর আয়াতগুলির সঠিক ব্যাখ্যা এবং বৈজ্ঞানিক যুক্তির উপর গুরুত্ব দেওয়া উচিত।

নাস্তিক– নাস্তিক তারা, যারা সৃষ্টিকর্তার অস্তিত্বে বিশ্বাস করে না। তারা সাধারণত প্রচলিত ধর্মগুলোর প্রতিও বিশ্বাস করেনা, তারা বিজ্ঞানভিত্তিক চিন্তাধারাকে সমর্থন করে। ধর্মীয় গ্রন্থ বা আচার-অনুষ্ঠানে বিশ্বাস করে না। যুক্তিবাদী এবং বিজ্ঞানভিত্তিক চিন্তাধারার অনুসারী। কিছু ক্ষেত্রে, তারা নৈতিকতা এবং মূল্যবোধের ক্ষেত্রে নিজস্ব বিচার-বুদ্ধিকে অনুসরণ করে। কেউ কেউ মনে করেন যে, ধর্মগুলো বিভেদ সৃষ্টি করে, নাস্তিক তিন ধরনের-

অধর্মী, অবিশ্বাসী এবং অজ্ঞেয়বাদী। কিছু কিছু মানুষ বিশ্বাস করেন যে, ধর্মীয় অনুশাসনই নৈতিকতার ভিত্তি। তবে, নাস্তিকরা তাদের নিজস্ব মূল্যবোধ এবং নৈতিকতার ভিত্তিতে জীবনযাপন করে। অপরদিকে, নাস্তিকতা কিছু মানুষের কাছে একটি স্বাধীন চিন্তাভাবনার প্রকাশ এবং যুক্তিবাদী দৃষ্টিভঙ্গির পথ। আবার অনেক নাস্তিকরা মনে করেন, ধর্ম পালনের থেকে বেরিয়ে এসে যুক্তির ভিত্তিতে জীবনকে উপলব্ধি করা উচিত।

মাছি সম্পর্কে ইসলাম ও বিজ্ঞান

হযরত মুহাম্মদ (সাঃ) আজ থেকে ১৪০০ বছর আগে এ মাছির ব্যাপারে আমাদের সতর্ক করে গেছেন, যা আজ বর্তমান বিজ্ঞান অবলীলায় স্বীকার করে নিচ্ছে। এবং তা তারা স্পষ্ট দেখতে পাচ্ছে। ওবায়েদ ইবনে হুনায়েন (রাঃ) থেকে বর্ণিত, আমি আবু হুরায়রা (রাঃ) -কে বলতে শুনেছি, নবী (সাঃ) বলেছেন, তোমাদের কারো পানীয় দ্রব্যে মাছি পড়লে সেটাকে তাতে ডুবিয়ে দেবে। অতঃপর তাকে উঠিয়ে ফেলবে। কেননা তার এক ডানায় রোগ থাকে আর অন্য ডানায় থাকে রোগের প্রতিষেধক। *(বুখারি, হাদিস : ৩৩২০)*
ইবনুল কাইয়ুম জাওজি (রহঃ) এই হাদিসের ব্যাখ্যায় বলেছেন, মাছির মধ্যে এক ধরনের বিষ আছে, দংশন করলে মানুষের শরীর ফুলে যায়। আর অন্য পাখার মাঝে বিষ নিবারণের উপাদান রয়েছে। তাই রাসুল (সাঃ) বলেছেন, পুরো মাছিকে এই পানিতে ডুবিয়ে দিতে। এতে করে (যদি সে পানি পান করে) তার আর ক্ষতি হবে না। হে মানুষ ! একটি উপমা দেওয়া হচ্ছে, মনোযোগ সহকারে তা শোনো। তোমরা আল্লাহর পরিবর্তে যাদেরকে ডাকো তারা তো কখনও একটি মাছিও সৃষ্টি করতে পারবে না, এই উদ্দেশ্যে তারা সকলে একত্র হলেও। এবং মাছি যদি কিছু ছিনিয়ে নিয়ে যায় তাদের নিকট হতে, এটাও তারা এর নিকট হতে উদ্ধার করতে পারবে না। প্রার্থনাকারী এবং যার কাছে প্রার্থনা করা হয়, উভয় শক্তিহীন। *(সূরা আল হাজ্জ, আয়াত-৭৩)* এই আয়াত

মূলত তাদের উদ্দেশ্যে, যারা আল্লাহ ছাড়া অন্য কারও বা কিছুর উপাসনা করে। বিভিন্ন মনিষীর তথ্যমতে- একটি প্রাপ্তবয়স্ক মাছি মূলত পঁচা ফলমূল, সবজি, মৃতদেহ, মানব ও প্রাণী বর্জ্য, মল এবং দুধ, সিরাপ, মধুর মতো মিষ্টি জাতীয় তরল খাদ্য খেয়ে থাকে। তবে মনে রাখতে হবে— মাছিরা কেবল তরল খাদ্যই গ্রহণ করতে পারে। মাছিরা শক্ত খাদ্য সরাসরি খেতে পারে না। তারা প্রথমে নিজেদের মুখের বিশেষ এক প্রকার লালা (স্যালাইভা) দিয়ে খাদ্যটিকে রাসায়নিকভাবে ভেঙে তরলে পরিণত করে। এরপর মুখের সামনে থাকা স্পঞ্জের মতো নরম অংশের সাহায্যে সেই তরল খাদ্য শুষে নেয়।

মাছি-বৈজ্ঞানিকভাবেঃ মাছিরা ডিপ্টেরা (Diptera) বর্গ এবং ব্র্যাসিকেরা (Brachycera) উপবর্গের অন্তর্ভুক্ত।এদের শরীরে দুটি ডানা থাকে এবং এরা সাধারণত আকারে ছোট হয়। মাছির জীবনচক্র ডিম, লার্ভা, পিউপা এবং পূর্ণাঙ্গ এই চারটি দশার মাধ্যমে সম্পন্ন হয়। পৃথিবীতে প্রায় ১,৫০,০০০ প্রজাতির মাছি রয়েছে। এদের মধ্যে গৃহমাছি (Musca domestica) এবং ফলের মাছি (Tephritidae) বিশেষভাবে পরিচিত।

মাছি বিভিন্ন রোগ যেমন কলেরা, টাইফয়েড, এবং ডায়রিয়ার মতো রোগের জীবাণু বহন করতে পারে। ২০১১ সালের একটি গবেষণায়, বিজ্ঞানীরা ড্রোসোফিলা মেলানোগাস্টার (Drosophila melanogaster) নামক এক প্রকার মাছির ওপর গবেষণায় বেশ কিছু গুরুত্বপূর্ণ তথ্য আবিষ্কার করেছেন। এই মাছি জিন গবেষণার জন্য একটি জনপ্রিয় মডেল প্রজাতি। এই গবেষণায় বিজ্ঞানীরা মাছির জিনগত গঠন, শারীরবিদ্যা, রোগ সৃষ্টিকারী জীবাণুর সংক্রমণ এবং বিবর্তন সম্পর্কে নতুন তথ্য জানতে পেরেছেন। ড্রোসোফিলা মেলানোগাস্টারকে (Drosophila melanogaster) জিন গবেষণার জন্য একটি আদর্শ মডেল প্রজাতি হিসেবে বিবেচনা করা হয়, কারণ এর অনেক বৈশিষ্ট্যই মানুষের সাথে সাদৃশ্যপূর্ণ। এই মাছির জিনোম ছোট এবং সহজেই পরিবর্তন করা যায়, যা গবেষণাকে সহজ করে তোলে। এর মাধ্যমে বিজ্ঞানীরা ক্যান্সার, স্নায়ু রোগের মতো বিভিন্ন রোগের কারণ এবং চিকিৎসা সম্পর্কে জানতে পারেন। এছাড়াও, এই মাছি রোগ সৃষ্টিকারী জীবাণুর সংক্রমণ এবং তাদের বিরুদ্ধে মানবদেহের রোগ প্রতিরোধ ক্ষমতা সম্পর্কেও গুরুত্বপূর্ণ তথ্য সরবরাহ করে।

সুতরাং, ২০১১ সালের গবেষণায় ড্রোসোফিলা মেলানোগাস্টার-এর উপর গবেষণা করে বিজ্ঞানীরা জিনতত্ত্ব, শারীরবিদ্যা, রোগ-সংক্রমণ এবং বিবর্তন সম্পর্কিত বিভিন্ন বিষয়ে নতুন জ্ঞান অর্জন করেছেন।

লেখক পরিচিতি পড়তে কিউআর কোডটি স্ক্যান করুন

রেদওয়ানুল্লাহ

লেখক- রেদওয়ানুল্লাহ
এর- ২টি প্রবন্ধ

আমার বিশ্বাস, আমার প্রশান্তি

ঘণ্টায় ৯০ কিলোমিটার গতিতে ছুটে আসছে টুঙ্গীপাড়া এক্সপ্রেস। বিকেলের সোনালি আলো গোপালগঞ্জ স্টেশনের ওপর ছড়িয়ে পড়েছে অপার্থিব শান্তির মতো। প্ল্যাটফর্মের ওভারব্রিজে দাঁড়িয়ে মাওলানা জাকির সেই দৃশ্য দেখছিলেন। হঠাৎ তার দৃষ্টি এক জায়গায় স্থির হয়ে গেল। এক যুবক কোথা থেকে ছুটে এসে রেললাইনে শুয়ে পড়তে চাইছে। চোখের পলকে বুঝে গেলেন, সে আত্মহত্যা করতে এসেছে। এক মুহূর্ত দেরি না করে ছুটলেন তিনি। ঠেলে সরিয়ে দিলেন তাকে লাইন থেকে। ঠিক তখনই ঝড়ের গতিতে পাশ কাটিয়ে চলে গেল ট্রেনটি। প্রাণে বাঁচলো যুবকটি।

- আরে দোস্ত! এটা কী করতে যাচ্ছিলে?

- না! তুমি আমাকে কেন বাঁচালে? আমি আর থাকতে চাই না এই নিষ্ঠুর পৃথিবীতে। না, না, না! আমাকে বাঁচালে কেন! চিৎকার করে বলল— ইমরান আসাদ।

(মাওলানা জাকিরের শৈশবের অন্তরঙ্গ বন্ধু সে। হাইস্কুল শেষ করে ইমরান ঢাকায় একটি প্রাইভেট বিশ্ববিদ্যালয়ে ভর্তি হয়েছিল। আর জাকির তাবলিগ জামাতের সাহচর্যে এসে আলোর সন্ধান পেয়েছিল। পড়াশোনা শুরু করেছিল কওমি মাদরাসায়।)

- দোস্ত, শান্ত হও। কী হয়েছে বলো।

- ইমরান চোখ মুছে বলল, “আমি ব্যর্থ... আমি পরাজিত। সে মিথ্যা প্রেমের গল্প লিখিয়ে আমাকে ধোঁকা দিয়েছে...

- মাওলানা জাকির বুঝলেন, এটা ‘লাভ কেইস’।

জাকির দীর্ঘশ্বাস ফেললেন।

- “দোস্ত, তুমি এমন নাপাক প্রেমে জড়ালে কেন? আসল প্রেম তো আল্লাহর সাথে!

ইমরান হঠাৎ হাসতে লাগল।

- “হা হা হা! দোস্ত! এই কষ্টের মাঝেও তুমি আমাকে হাসালে! আল্লাহ?! আল্লাহই তো নেই! তার সাথে আবার সম্পর্ক-মহব্বত?

- জাকিরের কণ্ঠ দৃঢ় হলো। “আচ্ছা, তুমি বলো, এই সুবিশাল মহাবিশ্ব

কে সৃষ্টি করেছে?

- ইমরান উত্তর দিল, বিজ্ঞান বলে, বিগ ব্যাং!

জাকির মৃদু হাসলেন।

- হতে পারে। কিন্তু ভেবে দেখো, বিস্ফোরণ মানেই বিশৃঙ্খলা। অথচ এই মহাবিশ্ব কত সুন্দরভাবে সাজানো! একটা উদাহরণ দিই— ধরো, কিছু কাগজ হঠাৎ বিস্ফোরিত হলো, তারপর নিখুঁত একটি বই তৈরি হলো। তুমি কি এটা বিশ্বাস করবে? ইমরান কিছুটা থেমে গেল। মুখ নরম হলো খানিকটা। জাকির তেলাওয়াত করলেন;

أَمْ خُلِقُوا مِنْ غَيْرِ شَيْءٍ أَمْ هُمُ الْخَالِقُونَ "তারা কি কিছু ছাড়াই সৃষ্টি হয়েছে? নাকি নিজেরাই নিজেদের স্রষ্টা?" -*(সূরা আত-তূর ৩৫)*

"দেখো দোস্ত, আল্লাহ আমাদের যুক্তির ওপর আহ্বান করছেন। তুমি "কিছু না" থেকে কীভাবে হতে পারো?

আর ভেবে দেখো তো, নিজেরা যদি নিজের স্রষ্টা হতাম, তাহলে আমরা কেন নিজেদের মৃত্যুকে ঠেকাতে পারি না? ইমরান কিছু বলল না। তার চোখে কেমন একটা অস্থিরতা। ভেতরে যেন প্রশ্নের ঝড় বইছে আর সেই ঝড়ের মাঝেই ধীরে ধীরে গুঞ্জন দিচ্ছে বিশ্বাসের বীজ, প্রত্যাবর্তনের অংকুর।

ঈমান ও বিজ্ঞান: কিছু বিজ্ঞানীর ইসলাম গ্রহণের উপাখ্যান

অনেকের ধারণা, বিজ্ঞানীরা ধর্মে বিশ্বাস করেন না। বিশেষ করে নাস্তিকদের মধ্যে একটি প্রচলিত মত হলো, "বিজ্ঞান ও ঈমান একসাথে চলতে পারে না"। কিন্তু বাস্তবতা এই ধারণাকে ভেঙে দেয়। অতীত থেকে বর্তমান পর্যন্ত বহু বিজ্ঞানী ইসলামকে সত্যধর্ম হিসেবে গ্রহণ করেছেন। তারা কোরআনের যুক্তি, জীবনদর্শন ও আধ্যাত্মিক গভীরতা থেকে ঈমানের আলো খুঁজে পেয়েছেন।

ব্রুনো গুইডারদনি (Bruno Guiderdoni) ফরাসি জ্যোতির্বিজ্ঞানী, ১৯৮৭ সালে ইসলাম গ্রহণ করেন। নাম রাখেন আব্দুল হক। গ্যালাক্সির গঠন ও বিবর্তনে বিশেষজ্ঞ, ১৫০টিরও বেশি গবেষণা প্রবন্ধ প্রকাশ করেছেন। বর্তমানে ইসলামিক ইনস্টিটিউট ফর অ্যাডভান্সড স্টাডিজ-এর পরিচালক। *বিস্তারিত: www.themuslim500.com*

জ্যাকি ইয়ি-রু ইয়িং (Jackie Yi-Ru Ying), তাইওয়ানে জন্ম নেওয়া মার্কিন ন্যানোটেকনোলজি বিজ্ঞানী। সিঙ্গাপুরে Institute of Bioengineering and Nanotechnology -এর প্রতিষ্ঠাতা নির্বাহী পরিচালক। ২০০১ সালে ইসলাম গ্রহণ করেন।

সূত্র: رهیافته (rahyafthea.ir)
জেফরি ল্যাং (Jeffery Lang) আমেরিকান গণিতবিদ। বিশ্ববিদ্যালয়ে পড়ার সময় কোরআনের যুক্তি তাঁকে মুগ্ধ করে। “My journey to Islam” শিরোনামে তার একটি ইংলিশ ভিডিও আছে সেখানে তার ইসলাম গ্রহণের অনেক কথাবার্তা উঠে এসেছে।
আরো দেখুন— Didsbury mosque, Islam on demands ইউটিউব চ্যানেলে। ফাতিমাহ জ্যাকসন (Fatimah Jackson) আমেরিকান জীববিজ্ঞানী ও নৃতত্ত্ববিদ। ফাতিমাহ সম্পর্কে উইকিপিডিয়াতে বলা আছে; “Jackson is an observant Muslim; she converted when she was in graduate school at Cornell University”. বর্তমানে হাওয়ার্ড বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাপক। *আরো দেখুন: www.alorpoth.com*
ড. হেনরি ক্লাসেন (Dr. Henry Klassen), স্টেম সেল বিজ্ঞানী ও চক্ষুবিশেষজ্ঞ। হার্ভার্ড বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাপক। বংশগত অন্ধত্বের চিকিৎসায় স্টেম সেল ওষুধ উদ্ভাবন করেছেন। ২০২৪ সালের রমজানে ইসলাম গ্রহণ করেন। *সূত্র: www.stem cell.uci.edu. www.ourislam.com*

লেখক পরিচিতি পড়তে কিউআর কোডটি স্ক্যান করুন

মাসউদ

লেখক- আব্দুল্লাহ মাসউদ -এর ২টি প্রবন্ধ

আকাশের চিঠি

রাত গভীর। শহর ক্লান্ত হয়ে ঘুমিয়ে পড়েছে, কেবল আকাশ এখনো জেগে আছে। তারাগুলো নীরব আলো ছড়িয়ে যেন এক অদৃশ্য ভাষায় কথা বলছে। আনিস ছাদের কিনারায় বসে আছে। হাতে কফি, চোখে অস্থিরতা, মনে প্রশ্ন—“আল্লাহ কি সত্যিই আছেন?” শৈশবে তার বিশ্বাস ছিল স্বচ্ছ নদীর মতো। মায়ের দোয়ায়, আজানের সুরে, কুরআনের তিলাওয়াতে সে অনুভব করত—আল্লাহ খুব কাছে। কিন্তু বয়স বাড়লেই কি বিশ্বাস বড় হয়? বিশ্ববিদ্যালয়ে এসে বইয়ের ভারে চাপা পড়ল তার সরলতা। বিজ্ঞান শেখাল সূত্র, দর্শন শেখাল সন্দেহ। আনিসের মনে জন্ম নিল প্রশ্নের ঝড়—“যদি সবই নিয়মে চলে, তবে নিয়মদাতা কোথায়”? কফির ধোঁয়া আকাশের দিকে উড়ে যায়, যেন তার অস্থির ভাবনাগুলো অদৃশ্য বাতাসে মিশে যায়। তার চোখে পড়ে নক্ষত্রের মিছিল- নীরব

অথচ শৃঙ্খলাপূর্ণ। পদার্থবিদ্যা বলেছে—"প্রতিটি কণা, প্রতিটি গতি সূত্রে বাঁধা"। কিন্তু আনিস ভাবে- সূত্রগুলো কে লিখেছে? নিয়ম তো নিছক একা জন্মায় না, এর পেছনে কি কোনো জ্ঞানী সত্তা নেই? ঠিক সেই মুহূর্তে মনে প্রতিধ্বনিত হয় এক আয়াত—
صُنْعَ اللَّهِ الَّذِي أَتْقَنَ كُلَّ شَيْءٍ ("এ আল্লাহর সৃষ্টি, যিনি সবকিছুকে নিখুঁত করেছেন"। — *সূরা আন-নমল: ৮৮)*
আনিস থমকে যায়। সত্যিই তো- এই আকাশের সৌন্দর্য, পৃথিবীর ভারসাম্য, মানুষের হৃদয়ের স্পন্দন- সবকিছুতেই কি এক শিল্পীর স্বাক্ষর নেই? সে ভাবে, নক্ষত্রগুলো যেন অক্ষরে অক্ষরে লেখা আয়াত, যা মানুষ পড়তে জানে না। এই শৃঙ্খলা কি নিছক কাকতালীয়? যদি তাই হতো, তবে বিশৃঙ্খলা-ই তো শাসন করত মহাবিশ্বকে। অথচ অনন্তকাল ধরে এ আকাশ, এ পৃথিবী এক অদৃশ্য নিয়মে চলছে। হৃদয়ে ভেসে আসে আরও এক আয়াত-

إِنَّ فِي خَلْقِ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَاخْتِلَافِ اللَّيْلِ وَالنَّهَارِ لَآيَاتٍ لِأُولِي الْأَلْبَابِ

("নিশ্চয় আকাশমণ্ডলী ও পৃথিবীর সৃজন, এবং রাত ও দিনের আবর্তনে নিদর্শন আছে জ্ঞানীদের জন্য"। — *সূরা আলে ইমরান: ১৯০)*
আনিস অনুভব করে—তার প্রশ্নের উত্তর বইয়ে নয়, এই আকাশেই লেখা আছে। শুধু চোখ দিয়ে দেখা যায় না, দরকার হৃদয়ের দৃষ্টি। সে মনে করে ইব্রাহীম (আ.) -এর সেই মুহূর্ত, যখন তিনি নক্ষত্র, চাঁদ, সূর্যের দিকে তাকিয়ে সত্যকে খুঁজেছিলেন। ক্ষণিক আলো নয়, তিনি খুঁজেছিলেন সেই স্থায়ী সত্তা, যিনি ক্ষণস্থায়ীকে সৃষ্টি করেছেন। আনিসও যেন একই যাত্রায় পা রেখেছে। এক ফোঁটা অশ্রু গড়িয়ে পড়ে তার চোখ থেকে। মনে হয়—আল্লাহ কখনো দূরে ছিলেন না। দূরে ছিল তার মন, তার বিশ্বাস, তার দৃষ্টি। আকাশ আসলে কোনো রহস্য নয়, বরং খোলা এক চিঠি—যেখানে প্রতিটি তারা আল্লাহর অস্তিত্বের সাক্ষ্য। সে ধীরে ধীরে উঠে দাঁড়ায়। আকাশ নীরব, অথচ মনে হয় যেন তাকে উদ্দেশ করে বলছে—"আমি আছি, সবসময় আছি। তুমি কি আমায় অনুভব করো না? "আনিস বুক ভরে নিঃশ্বাস নেয়। রাতের আকাশে তারাগুলো আরও উজ্জ্বল মনে হয়। যেন প্রতিটি আলোকরেখা ফিসফিস করে লিখে দিচ্ছে—আল্লাহ আছেন, সর্বদা আছেন।

নক্ষত্রের ওপারে

রাত তিনটা। সারা শহর নিস্তব্ধ, কেবল মাঝেমাঝে দূরে কুকুরের ডাকে নীরবতা ভাঙে। রুহান টেলিস্কোপে চোখ রেখেছে। কাচের ওপারে ভেসে উঠছে অসংখ্য নক্ষত্র, নীহারিকা, গ্যালাক্সি- অসীম মহাকাশের নিঃশব্দ এক জগৎ। মহাকাশ যেন এক গভীর সাগর, যেখানে প্রতিটি আলো একটি তরঙ্গ, প্রতিটি গ্যালাক্সি একেকটি দ্বীপ। এক সময় সে দৃঢ় নাস্তিক ছিল। যুক্তি, বিজ্ঞান আর কঠোর বাস্তবতার বাইরে তার কোনো বিশ্বাস ছিল না। সে ভাবত- "যা প্রমাণ করা যায় না, তা নেই"। আল্লাহ, আখিরাত, ওহি—এসবকে কেবল প্রাচীন মানুষের কল্পনা বলে মনে করত। টেলিস্কোপ তার কাছে ছিল একমাত্র 'আস্তানা', যেখানে সে মহাবিশ্বকে পর্যবেক্ষণ করত, আর ভাবত- এই মহাবিশ্বে স্রষ্টার কোনো প্রয়োজন নেই। কিন্তু আজকের রাতটা ভিন্ন। এত বছরের গবেষণা, পদার্থবিদ্যার সূত্র, জ্যোতির্বিদ্যার হিসাব—সবকিছুই যেন তার ভেতরে এক অদ্ভুত শূন্যতা জাগাচ্ছে। এই অসীম নিয়মের ভেতরে দাঁড়িয়ে সে হঠাৎ প্রশ্ন করল- "এত নিখুঁত নিয়ম কি কেবল কাকতালীয়ভাবে সম্ভব? যদি সবই কেবল পদার্থ আর শক্তির খেলা হয়, তবে এই নিয়মের উৎস কোথায়"? তার ভেতরে লুকোনো এক চাপা স্মৃতি ধীরে ধীরে জেগে উঠল। শৈশবে মায়ের কণ্ঠে শোনা কুরআনের আয়াতগুলো মনে পড়তে লাগল। তার কানে ভেসে উঠল আল্লাহর কালাম—

خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ بِالْحَقِّ "তিনি আকাশমণ্ডলী ও পৃথিবীকে সত্যের সাথে সৃষ্টি করেছেন"। *(সূরা আন-নাহল: ৩)*

রুহানের বুক কেঁপে উঠল। কত বছর পর সে এই শব্দগুলো শুনল মনে মনে! তার চোখ ভিজে এল অজান্তেই। বিজ্ঞান তাকে দেখিয়েছে কীভাবে নক্ষত্র জ্বলে, কীভাবে গ্যালাক্সি ঘোরে, কীভাবে গ্রহরা তাদের কক্ষপথে ঘুরে বেড়ায়। কিন্তু এই নিয়ম কে স্থাপন করল- সে উত্তর কখনো দেয়নি। সে আবারও টেলিস্কোপে চোখ রাখল। দূরের নক্ষত্ররাজি যেন তাকে ডাকছে। প্রতিটি আলো বলছে- "আমরা নিছক কাকতালীয় নয়, আমরা সাক্ষ্য দিচ্ছি এক মহান স্রষ্টার"। হৃদয়ের ভেতরে সে প্রথমবার অনুভব করল, টেলিস্কোপের লেন্স দিয়ে হয়তো সৃষ্টি দেখা যায়, কিন্তু স্রষ্টাকে দেখা যায় না। স্রষ্টাকে খুঁজে পেতে হলে তাকাতে হবে নিজের অন্তরের গভীরে। রুহান ধীরে ধীরে টেলিস্কোপ সরিয়ে রাখল। জানালার ওপাশে ভোরের প্রথম আলো ফুটতে শুরু করেছে। অন্ধকার বিদায় নিচ্ছে, আকাশের রঙ বদলাচ্ছে। ঠিক সেই মুহূর্তে তার মনেও যেন আলো জ্বলে উঠল- দীর্ঘ অন্ধকার সন্দেহ আর অবিশ্বাসের পর এক নতুন প্রভাত। সে ফিসফিস করে

বলল—

"হে আল্লাহ, তুমি সত্যিই আছো। আমি দেরিতে হলেও তোমাকে খুঁজে পেয়েছি"। রাতের নীরবতা ভেঙে পাখিরা ডাকতে শুরু করল। আকাশে সূর্যের প্রথম কিরণ ঝলমল করে উঠল। আর রুহান জানল- তার হৃদয়ের টেলিস্কোপ আজ অবশেষে নক্ষত্রের ওপারে পৌঁছে গেছে।

লেখক পরিচিতি পড়তে কিউআর কোডটি স্ক্যান করুন

আসিফ

লেখক- আসিফ মাহমুদ -এর ৬টি প্রবন্ধ

একটি বীজের জবাব

মরুভূমির ধুলিধূসর প্রান্তে ছোট্ট এক গ্রাম, নাম আল-হাইরাহ। সূর্য এখানে যেন রোজ আগুন ছড়িয়ে দেয়, আর বৃষ্টির দেখা মেলে মাসের পর মাস পরে। এই জনপদের মানুষ জীবনের কঠিন বাস্তবতা মেনে নিয়েছে- শুকনো জমি, খালি কুয়া, আর হৃদয়ের এক কোণায় চাপা আশা। এই গ্রামের এক নিরীহ যুবক, নাম আসিফ মাহমুদ। বয়সে তরুণ, মননে প্রবীণ। তার দৃষ্টিতে অগাধ বিশ্বাস, মুখে সর্বদা "আলহামদুলিল্লাহ", আর অন্তরে এক অটল দীপ্তি- "আমার আল্লাহ আছেন। তিনিই সবকিছু পরিচালনা করেন"। আসিফ প্রতিদিন ফজরের পর গ্রামের পুরনো একটি পাহাড়ি পথ ধরে হেঁটে যেত পাশের পরিত্যক্ত জমিতে। সেই জমি মরুভূমির বুকে একটুকরো নিষ্প্রাণ শুষ্কতা- কেউ কখনো কিছু ফলাতে পারেনি সেখানে। একদিন গ্রামের বাইরে থেকে এক বিজ্ঞানমনস্ক, শিক্ষিত ভ্রমণকারী এলো- নাম তার রায়ান ফারুক। চোখে আধুনিকতার চশমা, মুখে যুক্তির তীর।

- রায়ান অবাক হয়ে জিজ্ঞেস করল; "তুমি এই মরুভূমির মাটিতে প্রতিদিন পানি ঢালো কেন? এই জমি তো মৃত"।

- আসিফ হেসে উত্তর দিল, "আমি শুধু পানি দিই না, বিশ্বাস ঢালি, দোয়া ঢালি। জানি না, কবে দেখা দেবে আমার রবের কুদরত"।

- রায়ান হেসে উঠল এবং বলল, "তুমি হয়ত আবেগী, কিন্তু বাস্তবতা হলো- বিজ্ঞান ছাড়া কিছু নেই। আমি কোনো আল্লাহকে দেখিনি, শুনিনি। যেটা চোখে পড়ে না, সেটা কি সত্যি আছে"?

- আসিফ তখন একটু থেমে বলল, "আচ্ছা, বাতাস কি তুমি দেখতে পাও"?

রায়ান চুপ।

- আসিফ আবার বলল, “তবুও বাতাসের অস্তিত্ব মানো, কারণ তার ছোঁয়া অনুভব করো। আমার আল্লাহও তেমন- তিনি অদৃশ্য, কিন্তু তাঁর নিদর্শন স্পষ্ট”।

এই বলে আসিফ সেদিন একটি খেজুর গাছের বীজ পুঁতে দিল সেই মৃত জমির বুকে। সকলে হাসল।

- বলল, “পাগল হয়েছে ছেলেটা”!

কিন্তু আসিফ থামল না। প্রতিদিন ফজরের পরে গিয়ে সে পানি দিত, দোয়া করত, সূরা ইয়াসিন পড়ে শোনাতো সেই বীজকে। দিন পেরিয়ে মাস... মাস পেরিয়ে বছর... তিন বছর পরে, এক ভোর বেলা, রায়ান আবার সেই পথে এল। তার চোখ বিস্ময়ে বড় হয়ে গেল- সেই মৃত জমিতে একটি সবুজ খেজুর গাছ মাথা তুলে দাঁড়িয়ে আছে! গাঢ় পাতা, সতেজ ডালপালা। রায়ান কাছে এসে দাঁড়িয়ে পড়ল। তার চোখ ভিজে গেল। আসিফ তখন নামাজ শেষ করে তসবি পড়ছিল।

- রায়ান বলল, “তোমার বিশ্বাস জিতে গেছে, আসিফ। আমি আজ বুঝেছি; আল্লাহকে দেখা না গেলেও, তাঁর কুদরত চোখে পড়ে”।

- আসিফ মৃদু হেসে বলল, “আল্লাহর অস্তিত্ব যুক্তির গণ্ডির বাইরেও এক বাস্তবতা। যে তাওয়াক্কুল করে, তাঁর জন্য আল্লাহ এমন জায়গা থেকে ব্যবস্থা করেন যেখান থেকে সে কল্পনাও করতে পারে না”।

○ *নৈতিক শিক্ষা:* আল্লাহর অস্তিত্ব বোঝা যায় তাঁর সৃষ্টির মধ্য দিয়ে, আর তাঁর উপর ভরসা মানুষকে এমন জয় দেয় যা যুক্তি, বিজ্ঞান ও মানবিক সীমাবদ্ধতার ঊর্ধ্বে। ধৈর্য, তাওয়াক্কুল ও ইমান থাকলে মরুভূমিও বাগান হয়।

সংশয়ের রাত

আসিফ মাহমুদ বিছানায় শুয়ে চোখ বন্ধ করল, কিন্তু ঘুম তাকে আঁকড়ে ধরল না। মাথায় ঘুরছে অসংখ্য প্রশ্ন, যেগুলো স্কুলে শোনা ধর্মীয় শিক্ষা আর বিশ্ববিদ্যালয়ে শেখা যৌক্তিক যুক্তির মধ্যে সংঘাত তৈরি করছে। “আল্লাহ সবকিছু জানেন”, ছোটবেলায় শিক্ষক বলতেন। “বিজ্ঞান ছাড়া কিছুই বিশ্বাসযোগ্য নয়”, কলেজে শোনা বক্তৃতা। বন্ধুরা বলে- “ধর্ম শুধু মানুষের আবেগের কল্পনা”। রাতের নিঃশব্দে আসিফ মনে করল- সবই কি সত্য? নাকি সে একা, অন্ধকারে হারিয়ে যাচ্ছে? সাহস জোগাচ্ছিল তার ছোট্ট মায়ের স্মৃতি। সেই মায়ের কোমল কণ্ঠ, তার পাশে থাকা সেই সান্ত্বনা। একদিন সে সাহস করে মায়ের কাছে গিয়েছিলো।

- "মা, তুমি কীভাবে জান যে আল্লাহ আছেন"?

- মা হেসে বললেন, "আসিফ, তুই যখন ছোট, আমার বুকে মুখ গুঁজে ঘুমাতি, আমি অনুভব করতাম। কিন্তু তুই কি সেটা বুঝতে পারিস"?

সেই রাতেই শহরে ঝড় উঠল। বাতাসে বিদ্যুতের ঝলকানি, চারদিকে নিঃশব্দ অন্ধকার। আসিফ জানালার পাশে দাঁড়িয়ে দেখল, ছোট্ট মোমবাতি কাঁপছে। একটা প্রশ্ন তার মনে প্রবেশ করল- "যদি অন্ধকারই সত্য হয়, তবে কেন আলো কাঁপছে"? আসিফ বুঝল, বিশ্বাসও এমনই- ক্ষীণ, কিন্তু অদম্য। হঠাৎ সে হাত নিল কুরআনের দিকে। এলোমেলো পৃষ্ঠা খুলে চোখে পড়ল আয়াত: "যদি তুমি সন্দেহ করো, আমি তোমার সন্দেহকেই জানি এবং পথহীনদের পথ দেখাই"। মুহূর্তে মনে হলো, কেউ অদৃশ্যভাবে তাকে ছুঁয়ে গেছে। দিনগুলো পার হতে লাগল। আসিফ প্রতিদিন সকালে উঠে ফজরের নামাজ শেষে নিজের প্রশ্নগুলোকে আলোর আলোয় গুছাতে শুরু করল। বই, বিজ্ঞান, প্রকৃতি- সব কিছুতে খোঁজ করতে লাগল। কিন্তু কোনো যুক্তি তাকে পুরোপুরি সন্তুষ্ট করতে পারল না। একদিন সে শহরের পার্কে হেঁটে যাচ্ছিল। দেখল, ছোট্ট একটি শিশুর মুখে হাসি, মায়ের কোমল আলিঙ্গন। মুহূর্তের জন্য মনে হলো- "এই ভালোবাসা, এই শান্তি, এই অনুভূতি কোথা থেকে আসে"? সেই রাতে বিছানায় শুয়ে আসিফ লিখল- "বিজ্ঞান সব কিছু বোঝায় না, কিন্তু হৃদয়ের অনুভূতি, বিশ্বাসের শক্তি, সেইসব অদৃশ্য জিনিসগুলোও বাস্তব। হয়তো ঈমানও তাই- অদৃশ্য, কিন্তু স্পষ্ট"। রাত গভীর হলো। আসিফ জানল- সন্দেহ থাকতেই পারে, প্রশ্ন থাকতেই পারে, কিন্তু তার হৃদয়ে এক অদৃশ্য আস্থা জন্ম নিয়েছে। যে তাকে অন্ধকারেও আলো দেখায়, একাকীত্বেও সঙ্গ দেয়। সন্ধ্যা থেকে ভোর, ভয় থেকে আশা, অন্ধকার থেকে আলো- এই রাতগুলো আসিফকে শিখিয়েছে, সত্য শুধুমাত্র চোখে দেখা নয়, অনুভব করাও সত্যের অংশ। শেষে সে মৃদু হাসল, নিজের মনে বলল- "যে আলোর অস্তিত্ব শুধু দেখা যায় না, তাকে অনুভব করেই মানুষ ঈমান ধরে"।

একজন ডাক্তার ও এক অদৃশ্য জগত

ডাঃ আসিফ মাহমুদ একজন আধুনিক চিকিৎসক। তার বিশ্বাস বিজ্ঞান-প্রত্যেক রোগ, প্রতিটি চিকিৎসা, মৃত্যুর প্রকৃতি সবই কোষের নিয়মে বোঝার চেষ্টা করে। জীবনের বাস্তবতা তার চোখে সরল: মৃত্যু হলো শারীরিক প্রক্রিয়ার সমাপ্তি, আর চিকিৎসা হলো তার সীমাবদ্ধতা। একদিন হাসপাতালে এলো এক বৃদ্ধা রোগী, নাম জান্নাত আরা। ক্যান্সার তার শরীর ছড়িয়ে দিয়েছে, মৃত্যুর ছায়া তার চারপাশে ঘনঘন ঘুরছে। কিন্তু মুখে ছিল অদ্ভুত এক প্রশান্তি,

যেন সে জানত কিছু লুকানো সত্য। আসিফ বিস্মিত হয়ে জিজ্ঞেস করল-

- "আপনি এত শান্ত কেন"?

- বৃদ্ধা হেসে বললেন- "ডাক্তার, আমার শরীর দুর্বল, কিন্তু আমার আত্মা শক্ত। আমি জানি আমি কোথায় যাচ্ছি। হয়তো একদিন আপনি নিজেও বুঝবেন, যে শরীরের বাইরে একটা জগত আছে।"

দিনগুলো কেটে গেল। আসিফ বৃদ্ধার চিকিৎসা চালিয়ে যাচ্ছিল। এক রাত, বৃদ্ধার শরীর নিঃশব্দে ছেড়ে গেল। কিন্তু তার বিছানার পাশে রাখা ছোট্ট চিরকুটটি আসিফের চোখে পড়ল- "আমার শরীর হারলো, কিন্তু আমি হারিনি। আমি যাচ্ছি আমার প্রিয় রবের কাছে"। চিরকুটটি পড়ার পর আসিফের হৃদয় হঠাৎ নড়চড় করল। এতদিন পর্যন্ত সে মৃত্যুকে কেবল শারীরিক দৃষ্টিকোণ থেকে দেখেছে, কিন্তু এই শান্তি তাকে অচেনা এক জগতে পৌঁছে দিল। রাতের নিঃশব্দে আসিফ নামাজে দাঁড়িয়ে বলল–

- "হে প্রভু, যদি তুমি আছো, আমাকে ভুলিয়ে দিও না নিজেকে। আমাকে এমন শক্তি দাও যেন আমি অদৃশ্য জগতের সত্য বুঝতে পারি"।

পরবর্তী দিনগুলোতে আসিফ দেখল, তার মন অদ্ভুতভাবে বদলাচ্ছে। প্রতিটি রোগীর কাছে সে শুধুই বিজ্ঞান চোখে দেখছিল না; সে দেখছিল তাদের ভেতরের মানসিক ও আত্মিক শক্তি, বিশ্বাস ও আশা।

একদিন একটি শিশু রোগীর পাশে দাঁড়িয়ে সে ভেবেছিল- শিশুর চোখে যে আস্থা, যে নির্ভরতা, সেটিই কি বাস্তবতার চেয়েও শক্তিশালী? শিশু হাসল, হাত বাড়াল। আসিফ বুঝল, মানুষ শুধু শারীরিক নয়, আত্মার কাছেও বাঁচে। আসিফের হৃদয়ে এক নতুন আলো জাগল- একটি জ্ঞান যা বিজ্ঞান বোঝাতে পারে না। মৃত্যুর সঙ্গে দেখা হলেও সে শিখল, আত্মা হারায় না; হারায় শুধুই দেহ এবং ঈমান, বিশ্বাস ও আশা সেই অদৃশ্য জগতের সেতুবন্ধন। শেষে আসিফ মৃদু হেসে বলল—

- "বিজ্ঞান আমাকে শিখিয়েছে কীভাবে বাঁচতে হয়, কিন্তু বিশ্বাস আমাকে শিখিয়েছে কীভাবে মৃত্যুর সামনে শান্ত থাকতে হয়"।

ছায়াপথের অভিশাপ

চট্টগ্রামের একটি পুরনো শহরের অন্ধকার গলিপথে রাতে বাতাসে ভেসে আসে অদ্ভুত গন্ধ- মাটির গন্ধ, ধূম্রের গন্ধ, এবং কোথা থেকে যেন রহস্যময় হাওয়ার ফিসফিসানি। নবীন গবেষক আসিফ মাহমুদ শহরের প্রাচীন গ্রন্থাগারে কাজ করে। সে প্রাচীন গ্রন্থে লুকানো রহস্যের খোঁজে থাকে- একটি লেখা যা শতাব্দী ধরে হারিয়ে গেছে।

একদিন, গ্রন্থাগারের অন্ধকার কক্ষে কাজ করতে গিয়ে, সে একটি পুরনো কাগজ খুঁজে পায়। কাগজে অদ্ভুত চিত্র, অচেনা ভাষার ছাপ। আঙুল দিয়ে স্পর্শ করতেই হঠাৎ বাতি নিজে নিজে কাঁপতে শুরু করে। একটি গোপন দরজা খোলা হয়, যা আগে কখনো দেখেনি। কৌতূহল তাকে সেখানে প্রবেশ করায়। ভেতরে একটি প্রাচীন মন্দিরের মতো ঘর, যেখানে দেয়াল ভেঙে গিয়েছে, আর মাটিতে অদ্ভুত প্রতীক। "এ কি শুধুই লেখা, নাকি... কিছুর আহবান"? -মনেই প্রশ্ন জাগে। হঠাৎ ঘরের মধ্য থেকে একটি ছায়া উঠে দাঁড়ায়। দেখতে মানুষের মতো, কিন্তু চোখে অন্ধকার, শরীর অর্ধেক অদৃশ্য। ছায়া ফিসফিস করে বলল- "যে আমাকে আহবান করবে, তার জীবন বদলে যাবে। কিন্তু মূল্য দেবে সে, তার আত্মার ভয়ংকর ছাপ"। আসিফ প্রথমে ভয় পেল, কিন্তু কৌতূহল তাকে থামাতে পারল না। সে প্রতীকগুলো পড়া শুরু করল। দরজা খুলে বাইরে আসে, আর শহরের আকাশ অন্ধকারে ঢেকে যায়। ছায়া ধীরে ধীরে তার পিছনে আসছে। যতক্ষণ আসিফ পড়ল, সে বুঝল- এই ছায়া এক ধরনের অদৃশ্য শক্তি, যা প্রাচীন সময় থেকে মানুষের ভয় ও লোভের সঙ্গে বাঁধা। কিন্তু এটি শুধুমাত্র ভয় দেখায় না; এটি চায় মানুষের আত্মার শক্তি। আসিফের মন বলল- "যদি আমি এর সঙ্গে লড়াই না করি, শহর ও মানুষ বিপদে পড়বে"। সে তার জ্ঞান, সাহস, এবং বিশ্বাস দিয়ে এক অভূতপূর্ব লড়াই শুরু করল। প্রতিটি পদক্ষেপে ছায়া শক্তিশালী হলো, কিন্তু আসিফ থেমে থাকল না।

শেষ দৃশ্যে, সে প্রাচীন প্রতীকের উপর কুরআনের আয়াত উচ্চারণ করে। অদৃশ্য শক্তি চেঁচিয়ে উঠে অন্ধকারে মিলিয়ে যায়। শহরের বাতি আবার জ্বলে ওঠে, বাতাস শান্ত হয়। আসিফ জানে- এটি কেবল বিজয় নয়। এটি সত্যিকার অর্থে বিশ্বাস ও সাহসের পরীক্ষা। মানুষ ও অদৃশ্য শক্তির মধ্যকার সেই সন্ধিক্ষণে, সে বুঝল- ভয় কখনো চূড়ান্ত নয়, যদি বিশ্বাস থাকে।

পুতুলের মধ্যে পবিত্র আগুন

ঢাকার একটি পুরনো বস্তিতে এক বিধবা মা তার একমাত্র মেয়েকে নিরাপদ রাখতে নানা ধরনের তাবিজ ও জাদু-টোনার আশ্রয় নিয়েছিলেন। মেয়েটির ঘরে রাখা হয়েছিল একটি পুরনো পুতুল, যা মা বিশ্বাস করত ঘরের রক্ষাকবচ। কিন্তু একদিন রাতের অন্ধকারে মেয়েটি চিৎকার করতে করতে মা'কে বলল-

- "মা, পুতুল কথা বলছে... সে আমাকে ডাকছে, আমাকে আটকে রাখতে চাইছে। মায়ের চোখে ভয়, কিন্তু সে কোনো উত্তর দিতে পারল না। সংবাদ ছড়িয়ে পড়ল আশেপাশের এলাকায়। তখন ডাঃ আসিফ মাহমুদ,

একজন তরুণ গবেষক ও আধ্যাত্মিক শিক্ষিত ব্যক্তি, খবর পেলেন এবং ঘটনাস্থলে পৌঁছালেন। আসিফ পুতুলটির চারপাশে তাকালেন। সেখানে ঝুলছিল রক্তাক্ত তাবিজ, স্পষ্টতই শিরক ও কুফরির চিহ্ন।

- সে বলল, "পুতুল বা অন্য কোনো বস্তুতে ভরসা রাখা হারাম। আল্লাহ ছাড়া অন্য কিছুর কাছে আশ্রয় নেওয়া শিরক"। তারপর তিনি কুরআনের আয়াতুল কুরসি, সূরা ফালাক, সূরা নাস ও সূরা ইখলাস দিয়ে রুকিয়া শুরু করলেন।

রুকিয়ার শক্তি কাজ করতে শুরু করল। পুতুল থেকে বেরিয়ে এলো একটি অন্ধকার ছায়ামূর্তি, চোখ লাল, মুখে বিষাদের ছায়া।

- ছায়া চিৎকার করে বলল, "তাবিজের শক্তি আমার জীবন। আমি সেই পুতুলেই বন্দি"।

- আসিফ ধীরে ধীরে বললেন, "শক্তি কোনো তাবিজের মধ্যে নেই। আল্লাহর কালামই সত্যিকারের শক্তি। আমি তোমাকে মুক্ত করছি আল্লাহর নামের আলোয়"।

তার উচ্চারণে সূরা ফালাক ও নাসের আগুনের মতো শব্দ পুতুল ও ছায়াকে ঘিরে গেল। ছায়াটি চিৎকার করে ধীরে ধীরে মিলিয়ে গেল। অন্ধকার সরল হল, ঘর আলোয় ভরে উঠল। পরদিন, মেয়েটি আর রাতে ভয় পায় না। মা কাঁদতে কাঁদতে বললেন,

- "আমি ভুল করেছি। আল্লাহ ছাড়া কেউ সাহায্য করতে পারে না"।

- আসিফ মৃদু হেসে বললেন, "তাবিজ, যাদু বা শিরক থেকে মুক্তির একমাত্র পথ হলো ঈমান এবং কুরআনের আশ্রয়। বিশ্বাস রাখুন, আল্লাহ সাহায্য করবেন"। মেয়েটি আর ঘরের অন্ধকারে কাঁপে না। সব ভয় দূরে সরে গেছে। আসিফ জানল, এই একটি ছোট ঘরও, যেখানে পবিত্র কুরআনের শক্তি কাজ করে, অন্ধকারকে জয় করতে পারে।

গল্পের শিক্ষা: আল্লাহ ছাড়া অন্য কিছুর উপর ভরসা রাখা শিরক। সূরা ফালাক, নাস ও আয়াতুল কুরসি দিয়ে রুকিয়া করা নিরাপদ। ঈমান ও কুরআনের আশ্রয়ই সত্যিকারের শক্তি।

শেষ নামাজের রাত

ঢাকার হঠাৎ রাতের নিঃশব্দে, মাহমুদ ভাইয়ের বাসার কক্ষ এক অদ্ভুত শীতলতা অনুভব করছিল। তিনি ছিলেন এক সম্মানিত চিকিৎসক, নামাজ পড়া ও ঈমানদার মানুষ। কিন্তু সাম্প্রতিক বছরগুলোতে, কর্মব্যস্ততা এবং জীবনের বাহ্যিক আকর্ষণে তিনি নামাজ কমাতে শুরু করেছিলেন। তার হৃদয়ের মধ্যে

ধীরে ধীরে সন্দেহ এবং ভয় জন্ম নিচ্ছিল, যা তাকে কেবল শয়তানের ফাঁদে ফেলার জন্য যথেষ্ট ছিল। এক রাত, ঘরের অন্ধকারে হঠাৎ একটি ছায়া প্রবেশ করল। সে কোনো মানুষের মতো ছিল না; এ ছিল এক শক্তিশালী জ্বিন, যে মানুষের মৃত্যুর আগে ঈমান দুর্বল করে দিতে সক্ষম। জ্বিনটির চোখে অদৃশ্য আগুন জ্বলে উঠছিল। "তুই তো বড় ডাক্তার," জ্বিনটি ফিসফিস করে বলল, "নামাজ কেন পড়বি? মৃত্যুর আগে আর কী লাভ"? মাহমুদ ভাই প্রথমে ভয় পেলেন, কিন্তু তার ভিতরের ঈমান এখনো সম্পূর্ণ নিভে যায়নি। তবু, শয়তানের ফাঁদে ধরা পড়া সহজ হয়ে যাচ্ছে। তিনি ভেবেছিলেন, জীবনের সব অর্জন ও ধন-সম্পদ রেখে যাওয়া আর মৃত্যুর আগে নামাজের গুরুত্ব- সবই কতটা অপ্রয়োজনীয়। এই খবর বন্ধুদের মাধ্যমে পৌঁছায় আসিফ মাহমুদ-এর কাছে। আসিফ তড়িঘড়ি করে মাহমুদের বাড়িতে পৌঁছালেন। তিনি জানতেন, মৃত্যুর আগের এই রাতটি সবচেয়ে বিপজ্জনক।

- মাহমুদ ভাই, আসিফ বললেন, চোখে দৃঢ়তা নিয়ে, "এই নামাজই তোমার শেষ আশ্রয়। যদি তুমি ঈমানকে ফিরিয়ে আনো, এই জ্বিনের ফাঁদ থেকে নিজেকে রক্ষা করতে পারবে"। আসিফ শুরু করলেন শক্তিশালী রুকিয়া, ধীরে ধীরে উচ্চারণের সঙ্গে সুরেলা কণ্ঠে পড়লেন- সূরা ফাতিহা, আয়াতুল কুরসি, সূরা ফালাক, সূরা নাস ও সূরা মুলক। জ্বিনটি ক্রমশ উত্তেজিত হয়ে উঠল। সে চিৎকার করতে লাগল, কিন্তু আসিফ থেমে না। মাহমুদ ভাই ধীরে ধীরে দাঁড়িয়ে নামাজে প্রবেশ করলেন, তাঁর সিজদা হৃদয়ের ভেতর আলোর দ্যুতি ছড়িয়ে দিল। ঘরের অন্ধকারে আলো ছড়িয়ে গেল। জ্বিনটির ছায়া ধীরে ধীরে মুছে গেল। মাহমুদ ভাই অনুভব করলেন, মৃত্যুর আগে ঈমান ও নামাজই তার জীবনের সবচেয়ে শক্তিশালী অস্ত্র। রাত শেষে, মাহমুদ ভাই ফিরে এলেন পুরোনো নামাজে। চোখে জ্বলজ্বলানি, হৃদয়ে শান্তি। তিনি বললেন- "মৃত্যুর আগে নামাজই সবচেয়ে বড় অস্ত্র। শয়তান তার ফাঁদ পাতলেও, আল্লাহর নামাজ থেকে শক্তি নিলে কেউ হারায় না"।

উপসংহার ও শিক্ষাঃ নামাজ হলো বিশ্বাসের মূর্তি। মৃত্যুর সময় আত্মাকে রক্ষা করার সবচেয়ে বড় দোয়া।শয়তান ও জ্বিনরা মৃত্যুর আগে সবচেয়ে বেশি মনোযোগ দেয়। তাই নামাজ ও তাওবা না ছাড়া জরুরি। আল্লাহর কাছে ক্ষমা চাওয়া ও আত্মার সঠিক প্রস্তুতি মৃত্যুর আগে আলো ও শান্তির পথ দেখায়।

কুরআনঃ "তোমরা নামাজ কায়েম কর এবং তোমাদের মধ্যে যারা ঈমান এনেছে, তাদের সাথে নামাজে দৃঢ় হও"। *—সূরা বাকারাহ, আয়াত ১৩৮*

লেখক পরিচিতি পড়তে কিউআর কোডটি স্ক্যান করুন

রাকিব

লেখক- ফজলে এলাহী রাকিব -এর ১টি প্রবন্ধ

আল-ফিতনাতু আশাদ্দুম মিনাল কিতাল

সালাহউদ্দিন আর আমি বিগত ৪ বছর যাবত একসাথে একই রুমে আছি। সালাহউদ্দিন আমার তুলনায় অনেকটাই ধার্মিক। তা হওয়ারই কথা, সে মাদ্রাসায় পড়ুয়া আর আমি কলেজে। সালাহউদ্দিন মহাখালীতে একটি মাসজিদে পরে থাকে সারাদিন। কোটিপতি বাবার ছেলে অথচ থাকে একটি পুরনো ভবনের ছয় তলার সবচেয়ে জঞ্জাল রুমটিতে তাও আবার রাকিবের মতো একজন মধ্যবিত্ত পরিবারের ছেলের সাথে। যার নিকট হাজার টাকা সালাহউদ্দিনের এক পয়সার সমান। আমি পড়াশোনার পাশাপাশি নাবিস্কোর পাশে একটি হোটেলে কাজ করি। সালাহউদ্দিন প্রতিদিন আমি যখন কাজে আসি সে তখন হোটেলে এসে বসে থাকে। মাঝে মাঝে এক কাপ কফি নিয়েই ঘন্টার পর ঘন্টা কাটিয়ে দেয় নির্বাকে বই অধ্যায়নে। আমাদের এক বন্ধু রাজিন খুবই কোপন স্বভাবের। ৬ থেকে ৭ হলেই জনাব রেগে রক্তিম হয়ে যান। সালাত সাওম তো অনেক দূর জনাব আল্লাহ রাসূল’কে ও মানতে নারাজ। সে প্রায়ই সালাহউদ্দিন কে এসে বিরাগী করে তুলে। অবশ্য সালাহউদ্দিনের এতো বই পড়া দেখে আমারও মাঝে মাঝে ভীষণ বিরক্তি লাগে। সালাহউদ্দিন শান্ত মেজাজের ছেলে তার কথায় কোন কান না দিয়ে সে নিজের চিন্তায় মগ্ন থাকতো। একদিন রাজিন সালাহউদ্দিন কে কটাক্ষ করে বলল-

- সালাহউদ্দিন এই যে, দেখ; এটা একটা হোটেল এখানেও কি তুর বই হাতে নিয়ে থাকাটা মানানসই? তুই কি জানিস না তোদের কুরআনে বলা হয় “ اَلْفِتْنَةُ اَشَدُّ مِنَ الْقِتَالِ ” “আল-ফিতনাতু আশাদ্দুম মিনাল কিতাল” অর্থ: ফিতনা হত্যা থেকেও কঠিন। আর তুই এখানে ফিতনাহ রটাচ্ছিস!

- সালাহউদ্দিন মৃদু ভাবে একটি মুচকি হাসি দিয়ে বলল; রাজিন! তোমার চেষ্টা ভালো ছিলো। কিন্তু তুমি যেই ফিতনার কথা বলছো সেই ফিতনা দ্বারা উদ্দেশ্য হচ্ছে- শিরক। অর্থাৎ শিরক করা হত্যা থেকেও মারাত্মক।

- রাজিন রুষ্ট হয়ে বলে; তুই বললেই হলো? কোথায় ফিতনা আর কোথায় শিরক।

- সালাহউদ্দিন বলল; তুমি কি ফিতনা আর শিরক এর মাঝে সাদৃশ্যতা দেখতে চাও? নাকি ফিতনা অর্থ যে এখানে শিরক সেটা যে আমার কথা না

সেটা দেখতে চাও? - রাজিন এবার একটু ক্রুদ্ধতা কে হালকা করে বলল; আচ্ছা দেখা দেখি ফিতনা আর শিরকের মধ্যে কি সাদৃশ্য আছে? যার কারণে তুই ফিতনা কে শিরক বললি।

সালাহউদ্দিন এবার বলা শুরু করলো আমিও হাত থেকে টেবিল পরিষ্কারের গামছাটা রেখে তাদের টেবিলে গিয়ে বসলাম।

- সালাহউদ্দিন বলল; আমরা আল্লাহ তা-য়ালা কে একক মানি। আমরা আল্লাহর একক সত্তার প্রতি ঈমান আনি।

- রাজিন বলল; হুম.. তো? –

- মনে করো তুমি তোমার বাবা মায়ের একমাত্র সন্তান। তোমার একটি পৃথিবী আছে। তুমি যখন ইচ্ছা যেখানে ইচ্ছা যেতে পারো, ঘুরতে পারো, যখন যে দেশকে ইচ্ছা ধ্বসিয়ে দিতে পারো, চাইলে আবার একটি দেশ নির্মাণ করতে পারো।

- রাজিন; হুম...!

- এখন যদি তোমার এই পৃথিবীটায় ভাগ জমায় তোমার সদ্য জন্ম নেওয়া ভাই। অতঃপর তোমার পৃথিবী দু-ভাগে ভাগ হয়ে গেলো।

- রাজিন; হুম....! তারপর?

- এখন পৃথিবীর অর্ধেক তোমার অর্ধেক তোমার ছোট ভাইয়ের। তার মধ্যে আমেরিকার মালিকানা রয়েছে তোমার ছোট ভাইয়ের কাছে। আর তোমার এখন ইচ্ছা জাগলো আমেরিকা কে ধ্বসিয়ে দিয়ে পুনর্নির্মাণ করার। তুমি কি এখন তা পারবে?

- রাজিন ভদ্র ছেলের মতো মাথা নেড়ে জবাব দিলো; না....।

- এখন মনে করো তোমার যে করেই হোক আমেরিকা কে ধ্বসিয়ে পুনর্নির্মাণ করতেই হবে। তার জন্য তুমি যুদ্ধে পর্যন্তও জড়াতে পারো। কি পারো না?

- রাজিন; হুম...।

- তাহলে তোমার ভাষায় এটা হলো একটি ফিতনা। তাইনা?

- হুম..।

- তাহলে এবার বলো তো, এই যে এই ফিতনাটা শুরু হলো এটা কি কারণে হলো?

- রাজিন একটু চুপ করে জবাব দিলো; আমার ছোট ভাই জন্মানোতে।

- হ্যাঁ একদম তাই। এই যে তোমার ছোট ভাই তোমার শরিক হলো, যার কারণে এতো ফিতনা। তাহলে এবার বলো তো ফিতনা আর শিরকের মাঝে কতোটা পার্থক্য পেলে?

- রাজিন নিস্তব্ধ নিরুপায় নিস্তেজ পরাজিত হয়ে বলল; বস্তুত কোন পার্থক্যই নেই। তুই আমার চক্ষুদ্বয়ে আচ্ছাদিত পর্দা নিজ হাতে ছিড়ে ফেললি। আমি তোদের দু'জনকে সাক্ষী রেখে বলছি; আমিও আল্লাহর একক সত্তার প্রতি ঈমান আনলাম।

– আলহামদুলিল্লাহ।

লেখক পরিচিতি পড়তে কিউআর কোডটি স্ক্যান করুন

নাইম

লেখক- নাজমুল হাসান নাইম -এর ১টি গল্প

বিশ্বাসের প্রথম প্রার্থনা

রাত প্রায় সাড়ে এগারোটা বাজতে চলেছে। হাসপাতালের করিডোরে ঠান্ডা বাতাস ধীরে ধীরে কাঁপিয়ে দিচ্ছিল ইমরানের পুরো শরীর। অপারেশন থিয়েটারের লাল বাতি ঝলমল করে জ্বলছে। ভেতরে, কঠিন যুদ্ধে লড়ছে তার মা -স্ট্রোকের পর জীবন-মৃত্যুর এক সঙ্কট মুহূর্তে। ইমরান করিডোরের মেঝেতে চুপচাপ বসে আছে, মাথায় হাজার হাজার চিন্তার ঝড় বয়ে যাচ্ছে। ইমরান নিজেকে সবসময় যুক্তিবাদী ও বাস্তববাদী ভেবেছে। তার বিশ্বাস ছিল, "যা দেখা যায় না, তা নেই"। আল্লাহ, জান্নাত, আখেরাত—সবই ছিল তার কাছে কল্পকাহিনী মাত্র। বিশ্ববিদ্যালয়ের বিতর্ক মঞ্চে সে কখনোই বিশ্বাসী পক্ষের হয়ে দাঁড়ায়নি। বারবার বলেছে, "যখন পর্যন্ত কোনো প্রমাণ নেই, তখন বিশ্বাস কুসংস্কার"। কিন্তু আজকের এই মুহূর্তে, যখন তার মা অপারেশনের ওপর নির্ভর, সে নিজেও বুঝতে পারছে, তার যুক্তিবাদের জোর অনেক দুর্বল। বুকের ভেতর অজান্তেই একটা ভীতি ঘনাচ্ছে, শরীরের সমস্ত ঠান্ডা স্রোতেও যেন গায়ে কাঁপুনি ধরে। অপারেশনের আগে ডাক্তার গম্ভীর মুখে বলেছিল, "আপনি প্রার্থনা করবেন। আমরা সব চেষ্টা করব, বাকিটা সৃষ্টিকর্তার হাতে"। ইমরান চুপ ছিল। তার মন বলছিল, কাকে প্রার্থনা করব? সেই স্রষ্টাকে, যাকে কখনোই বিশ্বাস করিনি?' মনে হচ্ছিল, তার বিশ্বাস আর একদম ভেঙে পড়ছে। কিন্তু কিছুক্ষণ পর চোখ বন্ধ করে সে স্মৃতির জগতে হারিয়ে গেল- মায়ের কোমল মুখ, যখন সে ছোট ছিল, অসুস্থতার মেঘ ঘনিয়ে এলে মা কপালে হাত রেখে দোয়া করতেন। সেই সময় মনে হতো ওগুলো কেবল অভ্যাস, কিন্তু আজ সে ভাবছে, হয়তো ওগুলো ছিল কোনো অদৃশ্য শক্তির প্রভাব। তার মাথায় হুট করে একটা স্মৃতি ঝলক লাগল- গত মাসে পড়া এক গবেষণার কথা। হৃদযন্ত্র প্রতিস্থাপনের

পরে এক রোগী জানিয়েছিল, "আমি অনুভব করেছিলাম, কেউ আমার জন্য প্রার্থনা করছে"। বিজ্ঞান আজও প্রার্থনার সেই অদ্ভুত শক্তিকে পুরোপুরি ব্যাখ্যা করতে পারেনি। ইমরানের চোখ ধীরে ধীরে নামল। মুখ থেকে যেন অজান্তেই একটি মিষ্টি স্বর বের হলো-

- "হে আল্লাহ, যদি তুমি সত্যিই থাকো... যদি তুমি আমার মা-কে বাঁচাতে পারো... আমি আজ থেকে কখনো তোমার অস্তিত্ব নিয়ে সন্দেহ করব না"।

সেই মুহূর্তে অপারেশন থিয়েটারের দরজা খুলে গেল। ডাক্তার একটি শান্ত মুচকি হাসি নিয়ে বললেন-

- "আপনার মা এখন বিপদমুক্ত"। ইমরানের বুক ভরে উঠল এক অদ্ভুত স্বস্তিতে। সে কৃতজ্ঞতার অশ্রু ঝরাল তার চোখে।

তখন বুঝতে পারল, দেখা যায় না এমন একটি শক্তি আছে- একজন মহাশক্তি, যিনি সবকিছু নিয়ন্ত্রণ করেন; যিনি অন্ধকারে আলো দেন, হতাশার মাঝে আশার বার্তা পৌঁছে দেন এবং মানুষের নিঃশব্দ প্রার্থনায় সাড়া দেন। সেদিনের পর থেকে ইমরান শুধু চোখে যা দেখা যায়, তাতেই বিশ্বাস রাখে না। সে বিশ্বাস করে সেই মহাশক্তিতে, যিনি অদৃশ্য হলেও তার জীবন ও ভালোবাসার প্রতিটি কোণে উপস্থিত। আর সে জানে, জীবনের সবচেয়ে বড় যুদ্ধে মানুষের বিশ্বাসই সবচেয়ে শক্তিশালী অস্ত্র।

লেখক পরিচিতি পড়তে কিউআর কোডটি স্ক্যান করুন

লেখিকা- নাফিসা আত্বিরা রোদশী -এর ১টি প্রবন্ধ

রোদশী

আলো ও যুক্তির পথ

আরবের এক বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্র ইমরান, পদার্থবিজ্ঞানে পড়াশোনা করছে। জ্যোতির্বিজ্ঞান, মহাকাশ ও পদার্থের গঠন নিয়ে তার গভীর আগ্রহ। কিন্তু তার বন্ধু রায়ান সব-সময় প্রশ্ন করত-

- "তুমি বিজ্ঞান পড়ো অথচ ধর্মে এত বিশ্বাস রাখো? বিজ্ঞান আর ধর্ম তো একসাথে চলতে পারে না"!

ইমরান সবসময় শান্তভাবে উত্তর দিত,

- "ধর্ম মানে অন্ধ বিশ্বাস নয়, অন্তরের আলো ও যুক্তির সমন্বয়। আর কুরআন সেই আলো"।

একদিন রাতে বিশ্ববিদ্যালয়ের লাইব্রেরিতে বসে তারা পড়াশোনা করছিল। ইমরান একটি কুরআন খুলে বলল,

- "তুমি বলেছিলে কুরআন বিজ্ঞানের সাথে যায় না। আমি তোমাকে কয়েকটি উদাহরণ দেখাই"।

প্রথমে সে সুরা আয-যারিয়াত (৫১:৪৭) পড়ে শোনাল: وَالسَّمَاءَ بَنَيْنَاهَا بِأَيْدٍ وَإِنَّا لَمُوسِعُونَ "আর আমরা আকাশকে শক্তি দ্বারা নির্মাণ করেছি এবং আমরা তা সম্প্রসারণকারী"।

- ইমরান বলল, "দেখো, এখানে স্পষ্ট বলা হয়েছে মহাবিশ্ব ক্রমাগত প্রসারিত হচ্ছে। বিজ্ঞানীরা ২০শ শতকে হাবল টেলিস্কোপের মাধ্যমে এই সত্য প্রমাণ করেছে। অথচ কুরআনে এটি বলা হয়েছিল প্রায় ১৪০০ বছর আগে"। এরপর সে সুরা আল-আম্বিয়া (২১:৩০) পড়ল:

أَوَلَمْ يَرَ الَّذِينَ كَفَرُوا أَنَّ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ كَانَتَا رَتْقًا فَفَتَقْنَاهُمَا وَجَعَلْنَا مِنَ
الْمَاءِ كُلَّ شَيْءٍ حَيٍّ ۖ أَفَلَا يُؤْمِنُونَ

"অবিশ্বাসীরা কি দেখে না যে আসমান ও জমিন উভয়ই একসাথে যুক্ত ছিল, তারপর আমি উভয়কে পৃথক করেছি, আর পানি দ্বারা সমস্ত জীব সৃষ্টি করেছি? তবে কি তারা বিশ্বাস করবে না"?

"এটা বিগ ব্যাং থিওরির সাথেই মিলে যায়", ইমরান ব্যাখ্যা করল। "বিজ্ঞান বলে, মহাবিশ্ব একসময় এক বিন্দুতে কেন্দ্রীভূত ছিল, তারপর এক বিস্ফোরণের মাধ্যমে ছড়িয়ে পড়ে"। রায়ান মনোযোগ দিয়ে শুনছিল। ইমরান আবার পড়ল সুরা আন-নূর (২৪:৪০):

أَوْ كَظُلُمَاتٍ فِي بَحْرٍ لُّجِّيٍّ يَغْشَاهُ مَوْجٌ مِّن فَوْقِهِ مَوْجٌ مِّن فَوْقِهِ سَحَابٌ ۚ ظُلُمَاتٌ
بَعْضُهَا فَوْقَ بَعْضٍ إِذَا أَخْرَجَ يَدَهُ لَمْ يَكَدْ يَرَاهَا ۗ وَمَن لَّمْ يَجْعَلِ اللَّهُ لَهُ نُورًا
فَمَا لَهُ مِن نُّورٍ

"গভীর সাগরে অন্ধকার, যার উপর ঢেউ, তার উপর আরেক ঢেউ, তার উপর মেঘ- অন্ধকারের পর অন্ধকার। যদি সে তার হাত বের করে, তবে সে তা প্রায় দেখতে পায় না। আর আল্লাহ যাকে আলো দান করেননি, তার জন্য কোনো আলো নেই"। -"বিজ্ঞান আজ প্রমাণ করেছে সমুদ্রের গভীরে সূর্যের আলো পৌঁছায় না। কিন্তু নবীজির সময়ে কে জানত সাগরের গভীর অন্ধকারের কথা"? তারপর সে সুরা আল-মুমিনুন (২৩:১২-১৪) পড়ে দেখাল- ভ্রূণ গঠনের ধাপগুলো কীভাবে আধুনিক এমব্রিওলজির সাথে হুবহু মিলে যায়।

وَلَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ مِن سُلَالَةٍ مِّن طِينٍ
ثُمَّ جَعَلْنَاهُ نُطْفَةً فِي قَرَارٍ مَّكِينٍ

ثُمَّ خَلَقْنَا النُّطْفَةَ عَلَقَةً فَخَلَقْنَا الْعَلَقَةَ مُضْغَةً فَخَلَقْنَا الْمُضْغَةَ عِظَامًا فَكَسَوْنَا الْعِظَامَ لَحْمًا ثُمَّ أَنشَأْنَاهُ خَلْقًا آخَرَ ۚ فَتَبَارَكَ اللَّهُ أَحْسَنُ الْخَالِقِينَ

"আমি মানুষকে মাটির নির্যাস থেকে সৃষ্টি করেছি।
তারপর আমি তাকে একটি নিরাপদ স্থানে শুক্রকণা রূপে স্থাপন করেছি। তারপর শুক্রকণাকে আলাকা করেছি, আলাকাকে মুদগাহ করেছি, মুদগাহকে অস্থি করেছি, আর অস্থিকে মাংসে আবৃত করেছি। অতঃপর আমি তাকে এক নতুন সৃষ্টিতে রূপ দিয়েছি। সুতরাং কল্যাণময় তিনি আল্লাহ, সর্বশ্রেষ্ঠ স্রষ্টা"।
রায়ানের চোখ বিস্ময়ে ভরে উঠল। "এগুলো কি তুমি কোথাও থেকে মিলিয়ে বলছো"?

- ইমরান হেসে বলল, "না বন্ধু, এগুলো সেই কুরআন থেকে, যা মানুষের জন্য হিদায়াত, আর সেই হিদায়াত যুক্তি আর সত্যের উপর দাঁড়িয়ে আছে"।
রায়ান নীরব হয়ে গেল। লাইব্রেরির জানালা দিয়ে রাতের আকাশে তারা ঝলমল করছিল।

- সে ধীরে বলল, -"আজ আমি বুঝলাম, বিজ্ঞান ও কুরআন শত্রু নয়, বরং একে অপরের প্রমাণ"।
সেই রাত থেকে রায়ানের যাত্রা শুরু হলো- বিজ্ঞান থেকে ঈমানের পথে, আর সেই পথে তার আলো হয়ে রইল কুরআনের যুক্তিময়তা।

লেখক পরিচিতি পড়তে কিউআর কোডটি স্ক্যান করুন

জুনাইদ

লেখক- জুনাইদ বিন কামাল -এর ৩টি প্রবন্ধ

যেখানে শুরু, সেখানেই বিচার

গ্রামের এক নির্জন এলাকায় বাস করত বেশ কিছু সাধারণ মুসলিম। পাঁচ ওয়াক্ত নামায, রোজা, সদকা- সব কিছুই করতেন, তার মধ্যে কয়েকজন নাস্তিক টাইপেরও ছিল যারা মানুষকে পরকাল নিয়ে বিভ্রান্তির মধ্যে ফেলে। তারা মানুষের ধারে ধারে গিয়ে বলতো, আল্লাহ সত্যিই বিচার করবেন তো? এই দুনিয়ায় অনেকেই অন্যায় করে বেঁচে যায়, পরকালের বিচার কি আসলেই হবে? জুয়েল আর মিনার খুব ভালো বন্ধু, তাদের মাঝে অনেকদিন ধরে দেখা হয় নাহ, আজ হঠাৎ রাস্তায় দেখা হয়ে গেছে, তার বন্ধু মিনার এর সাথে, মিনার বলতে শুরু করলো,

- বন্ধু কেমন আছিস.?

- জুয়েল বললো আলহামদুলিল্লাহ ভালো আছি, তুই কেমন আছিস?

- মিনার বললো, আলহামদুলিল্লাহ আমিও অনেক ভালো আছি!

- আরেহ বন্ধু তোকে কেমন জানি চিন্তিত মনে হচ্ছে, কি নিয়ে চিন্তা করছিস.?

- জুয়েল; আসলে আমি চিন্তা করতেছি পরকাল নিয়ে, পরকালে কি হবে? না জানি পুলসিরাত পার হতে পারবো কিনা, জাহান্নামে যেতে হবে নাকি জাহান্নামে এসব নিয়ে আমি খুব চিন্তায় আছি! (মিনার ছিলো একটু নাস্তিক টাইপের সে মানুষকে এই সব বিষয়ে সন্দেহ ঢুকিয়ে দেয়)

- মিনার বলতে শুরু করলো; দুনিয়াতে কত মানুষ কত গুনাহ করেও বেঁচে যাচ্ছে, তুই এবং আমিও হয়তো বেঁচে যাবো তাদের মতো, এতো চিন্তা করার কি দরকার? (জুয়েল মাদ্রাসায় পড়েছিলো, জুয়েল বেশ ভালো জানতো যে পরকালে কি হবে/ হবে নাহ এইসব বিষয় জুয়েল এর খুব ভালো জানা আছে।)

- জুয়েল বলতে শুরু করলো; বন্ধু কুরআনের এক আয়াতে বলা আছে (ওয়ামতাজুল ইয়াওমা আইয়্যুহাল মুজ্ রিমুন) *সুরা ইয়াছিন, আয়াত নং ৫৯)* অর্থ: হে অপরাধীরা আজ তোমরা আলাদা হয়ে যাও।

যদি একটু বিশ্লেষণ করে বলি তাহলে; হে অপরাধীরা তোমরা যারা গুনাহের মধ্যে লিপ্ত ছিলে, দুনিয়াতে আমার মূমীন বান্দাদের সাথে ছিলে, এক গাছ থেকে ফল খেয়েছো, আমার নিয়ামত ভোগ-করেছো আমি আল্লাহ কিচ্ছু বলিনি, আজ তোমাদের উপর কোন রহম করা হবে নাহ, আজ তোমরা আলাদা হয়ে যাও। বলো বন্ধু সেদিন তুমি কি করবে? সেদিনের কঠিন দিনে কার আশ্রয় চাইবি, যিনি আশ্রয় দিবেন, দয়া করবেন, তিনিই তো বলবেন আলাদা হয়ে যেতে।

সেই রাতেই ঘুমাতে গিয়ে, জুয়েল দেখলেন এক স্বপ্ন, স্বপ্নে তিনি নিজেকে দেখলেন এক বিশাল ময়দানে, যেখানে লাখো-কোটি মানুষ জমা। কেউ পোশাকহীন, কেউ কাঁদছে, কেউ কাঁপছে। হঠাৎ এক উদঘোষণা হলো: আজ হিসাবের দিন! আজ কেউ কারও উপকারে আসবে না। *(সূরা আবাসা, আয়াত 34-37)*

তার চোখের সামনে এক লোককে দাঁড় করিয়ে তার আমলের হিসাব নেওয়া হচ্ছে। তিনি ছিল এক ধনী ব্যক্তি, দুনিয়ায় নামাজ, যাকাত সবকিছুই আদায় করতেন। আজকে তার সামনে তার নেক-খাতা OPEN করা হলো। একে একে তার সব ভালো কাজ সামনে আনলো ফেরেশতারা। তারপর তাকে দাঁড় করানো হলো। তার আমলনামা দেওয়া হলো ডান হাতে।

- মাওলা বললেন: অতঃপর আজ আমি তোমার ওপর সন্তুষ্ট। যাও, জান্নাতের আনন্দ তোমার জন্য। *(সূরা ইনশিকাক, আয়াত 7-9)*

এর পর আরেকজন ধনী ব্যাক্তিকে দাঁড় করিয়ে তার আমলের হিসাব নেওয়া হচ্ছে, তার ধন সম্পদ ছিলো, সে যাকাত আদায় করতো নাহ, নামাজ পড়তো নাহ, মানুষের উপরে জুলুম করতো, পাপ কাজের মধ্যে লিপ্ত থাকতো অতঃপর তার আমাল নামা বাম হাতে দেওয়া হলো।

- জুয়েল কেঁদে ফেললেন... বলেন, "হে আল্লাহ! আমাকে আরেকটা সুযোগ দিন"!

সঙ্গে সঙ্গে ঘুম ভেঙে গেল। এরপর... তিনি ঘাম drenched, ভোর হয়েছে। সেই দিন থেকেই, তিনি শুধু নিয়মিত ইবাদত না, বরং পরকালকে সামনে রেখে প্রতিটি কাজে নিয়্যত ঠিক করতে শুরু করলেন।

গল্পের শিক্ষা:

- ✓ পরকাল আছে — এটা ঈমানের ছয় রুকনের একটি।
- ✓ এই দুনিয়া কেবল পরীক্ষার মাঠ, আসল জীবন শুরু হবে মৃত্যুর পর।
- ✓ কুরআনে বলা হয়েছে: প্রত্যেক প্রাণীকে মৃত্যুর স্বাদ নিতে হবে এবং তোমরা কেয়ামতের দিন তোমাদের কর্মফল পূর্ণরূপে পাবে। *(সূরা আলে ইমরান ৩:১৮৫)*
- ✓ হাদীসে এসেছে: বুদ্ধিমান সে, যে নিজের নফসকে দমন করে এবং মৃত্যুর পরের জীবনের জন্য প্রস্তুতি নেয়। *(তিরমিজি)*

তাকদির vs বিশ্বাস

মুজাহিদ খুবিই নম্র-ভদ্র টাইপের ছেলে, ছোট থেকে তার মাইন্ড ছিলো ইসলামিক, সে তার মনের সব আশা-আকাঙ্ক্ষা আল্লাহ থেকে চেয়ে নিতো, তার কোন কিছু প্রয়োজন হলে মসজিদে গিয়ে নামাজ পড়ে আল্লাহর দরবা'র থেকে চেয়ে নিতো, এক কথায় সে ছিলো আল্লাহভীরু। কিন্তু তার এক বন্ধু উৎস সে ছিলো নাস্তিক, কলেজ ক্যাম্পাসে দেখা তাদের আজ অনেক দিন পর, একাডেমিক পড়ালেখার বিষয় নিয়ে তাদের মধ্যে অনেক্ষণ কথা বাত্রা হলো গল্প করতে করতে প্রায় সময় দুপুর একটা, আজান হয়েছে মুজাহিদ বললো-

- দোস্ত আজান হয়েছে আমি নামাজটা আদায় করে আসি।

এটা বলার পর হঠাৎ উৎসের মনে কয়েকটি প্রশ্ন ঘুরপাক খাচ্ছে কেমনে তার বন্ধু মুজাহিদকে আস্তিক থেকে নাস্তিক বানানো যায়, মুজাহিদ নামাজ আদায় করে আসতে আসতে ততক্ষণে উৎস প্রশ্ন রেডি করে রেখেছেন। মুজাহিদ

নামাজ শেষে তার পাশে এসে বসতে না বসতেই, মুজাহিদকে বললো,

- আচ্ছা দোস্ত একটা কথা বলবি?

- হু, বল কি কথা!

- মুজাহিদ, আচ্ছা তুই যে আল্লাহ থেকে এইটা চাস, ওইটা চাস, এগুলো চাওয়ার এতো দরকার কি?

- মুজাহিদ বললো, ওমাহ আমি আল্লাহ থেকে চাইবো না তাইলে কার থেকে চাইবো?

- সাথে সাথে উৎস হা হা হা হা করে হেসে বললো, আরে বোকা, তুদের পাঁচ কালিমার মধ্যে ঈমানে মুজমাল নামক কালিমাতে তো বলা হয়েছে ভালো মন্দ তাকদিরের উপর ফায়সালা, তাইলে তুর এতো কষ্ট করে আল্লাহর ইবাদাত করে চাওয়ার কি দরকার? যেহেতু আগে থেকেই তোর তাক্বদীরে লিখে দেওয়া হয়েছে। (ও হ্যাঁ একটা কথা আগে থেকে বলেই রাখি, মুজাহিদ খুব বই পড়ে, ও জানতো যে এই রকম প্রশ্নের সম্মুখীন সে হতে পারে তাই সে আগে থেকেই এই ধরনের প্রশ্নের উত্তরগুলো ভালোভাবে গবেষণা করে রেখেছেন)

যাই হোক মূল কথায় ফিরে যাই, তারপর মুজাহিদ তাকে বলা শুরু করলেন,

- বন্ধু শোন তাহলে এই প্রশ্নের উত্তর যদি তুর জানতে হয় তাহলে প্রথমে তুর জানতে হবে তাকদীর কি? তাকদীর অর্থ হচ্ছে পূর্বনির্ধারণ,

- হ্যাঁ।

আল্লাহ সব কিছু জানেন এবং লাওহে মাহফুজে লিখে রেখেছেন, *(সূরা হাদীদ, আয়াত নাম্বার ২২)* কিন্তু আল্লাহ এই লেখা জোর করে নয় বরং আল্লাহ জানেন কে কি করবে কি পাবে এবং পাবে নাহ এইসব, কারণ তিনি হচ্ছেন আ'লিমুল গায়েব তাই সেই জ্ঞানই আগে থেকে লিখে রেখেছেন। এই বিষয়ে হাদিসে এসেছে, রাসুল (সাঃ) কে সাহাবায়ে কেরামগণ জিজ্ঞাস করেছিলেন, তারা বললেন হে আল্লাহর রাসুল (সাঃ) যদি সবকিছুই আগেই নির্ধারিত থাকে তাহলে আমরা আ'মল করবো কেন?

- তিনি উত্তরে বল্লেন; তোমরা আমল করো, কারণ যার জন্য জান্নাত লেখা আছে সে জান্নাতবাসীর আমল'ই করবে, আর যার জাহান্নাম লেখা আছে সে জাহান্নামীর মতোই আমল করবে, *(সহীহ মুসলিম : ২৬৪৭)*

এখানে বোঝানো হয়েছে তোমার আম'লই প্রমাণ করবে তুমি কোথায় যাবে, তাই আমল করাই জরুরী। আর বিজ্ঞান দিয়ে যদি তুমাকে বুঝাতে যাই, তাহলে আজকের বড় বড় বৈজ্ঞানিকরা যদি রিসার্চ করে বলতে পারে কাল বৃষ্টি হবে, আগামী এক সাপ্তাহ গরমের তীব্রতা খুব বেশি থাকবে ইত্যাদি ইত্যাদি।

তেমনিভাবে আল্লাহর জ্ঞান সীমাহীন তিনি সময়ের আগেও দেখেম -পরেও দেখেন, তাই তিনি জানেন কে কি করবে, তবে তিনি কাউকে বাধ্য করেন নাহ। চূড়ান্ত উত্তর হলো, আমরা আল্লাহর ইবাদত এই জন্যই করবো যে, আল্লহ আমাদের চেষ্টা ও নিয়তের বিচার করবেন। *(সূরা নিসা: ৩)*

আমলই প্রমান করে আমরা কোন দলের মানুষ, আমরা জানি-না আমাদের তাকদির কী তাই আমাদের সর্বোচ্চ চেষ্টা করা খুবই জরুরী। ইবাদাতের মাধ্যমে তাকদির বদলানো যায়, *(হাদীস: দু'আ ও সদকা তাকদীর বদলায় -তিরমিযী।)*

শেষ কথা, তাকদীর বিশ্বাস করা আমাদের ঈমানের অংশ, কিন্তু তাকদিরকে অজুহাত বানিয়ে বসে থাকা যাবে নাহ এটি একটা শয়তানের ধোঁকা, আমাদের কাজ হলো সুন্দরভাবে চেষ্টা করে যাওয়া এবং আল্লাহর রহমতের আশায় থাকা।

অন্ধকার থেকে আলোর পথে ফিরে আসার গল্প

সানি মিয়া ছোট থেকে তার সে পারিবারিকভাবে ছিলো সাংস্কৃতি যুগের অত্যাধুনিক জগৎ নিয়ে, তার মনোবল এমন ছিলো যে দুনিয়াটা চিরস্থায়ী একটা জায়গা, (অথচ রাসূল সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন দুনিয়া মুমিনদের জন্য জেলখানা আর কাফেরদের জন্য বেহেশতখানা) সানি বরাবরই অত্যাধুনিক জগৎ তথা বেহায়াপনা গুনাহের কাজ নিয়ে লিপ্ত থাকে।

একদিন তাদের গ্রামের মসজিদে দাওয়াতে তাবলীগ এসে পৌছায় (আজকাল আমাদের একটা রীতিনীতি আছে যে দাওয়াতে তাবলীগ দেখলে পালিয়ে যাওয়া, কারণ তাদের সাথে কথা বললে মসজিদে যাইতে হবে, হু যাইতে চাই নাহ ঠিক তবে দাওয়াতে তাবলীগের মানুষদের প্রতি কিন্তু একটা শ্রদ্ধা থাকে, (মুনাফিক, বেঈমান ছাড়া) যাই হোক, সানিও তাদের দেখে পালাতে চেয়েও পারেনি, অনিচ্ছা সত্ত্বেও তাদের সামনে গিয়ে পড়লো। সেখান থেকে এক মাওলানা সাহেব শুরু করলেন প্রথমে মৃত্যুর কথা দিয়ে, মাওলানা সাহেব বলতে লাগলেন হে ভাই শুনো, তুমি ভালো করে খেয়াল করে দেখো, তোমার বয়সী তোমার চাইতে আরো ছোট্ট কত মানুষ মারা যায়, তাদের ভীড়ে আল্লাহ তোমাকে সর্বপ্রথম জীবিত রেখেছে এবং সুস্থ রেখেছে। সানির মনে একটু ধাক্কা লাগলো আসলেই তো গত কিছুদিন আগেই তো আমার এক ফ্রেন্ড বাইক এক্সিডেন করে মারা যায় এবং এরকম কতশত যুবক মারা যাচ্ছে, যারা এখনো মৃত্যুবরণ করার কথা নাহ। তারপর মাওলানা সাহেব শুরু করলেন, কবরের আজাব এর কথা বলতে লাগলেন, শুনে রাখেন ভাই, যেদিন আমি এবং আপনাকে কবরে রাখা হবে সেদিন যদি নেক আমল করে যান, কবর ডাক দিয়ে বলবে আজ তোমাকে আমার কাছে সোপর্দ করা হয়েছে, অভিনন্দন!

তোমার আগমন শুভ হোক, পৃথিবীতে যত মানুষ বিচরণ করেছে, তুমি ছিলে আমার কাছে সবচেয়ে প্রিয় আজকে তুমি যখন আমার কাছে এলে তুমি দেখতে পাবে, তোমার সাথে আমার সর্ব সুন্দর ব্যবহার, এরপর সেই মৃত ব্যক্তির দৃষ্টিসীমা পর্যন্ত তার কবরকে প্রশস্ত করে দেওয়া হবে, এবং জান্নাতের দিক থেকে একটা দরজা খুলে দেওয়া হবে, এই দরজা দিয়ে তার কবরে জান্নাতের সুবাস এবং জান্নাতি বাতাস আসতে থাকবে।

অন্যদিকে কোন পাপিষ্ঠ ব্যক্তিকে যদি কবরে রাখা হয়, কবর বলবে তোমার আগমন বড়ই অশুভ! বড় নিকৃষ্ট আগমন হলো তোমার, পৃথিবীতে যত মানুষ বিচরণ করেছে তার মধ্য থেকে তুমিই হলে সবচেয়ে ঘৃনিত মানুষ, আজ তোমাকে আমার কাছে রাখা হয়েছে, এবার তুমি দেখবে তোমার প্রতি আমার ভয়াবহ আচরণ, এরপর তার পেছনে সত্তরটা সাপ লেলিয়ে দেওয়া হবে, সেখান থেকে একটা সাপ- যদি পৃথিবীতে একবার নিঃশ্বাস ফেলতো তাহলে পৃথিবীর বুকে গাছ-ফালা, তরুলতা ইত্যাদি কিছুই জন্মাতো না, সেরকম সাপ-গুলো তাকে কিয়ামত পর্যন্ত দংশন করতে থাকবে, দেখেন ভাই এবার কি করুণ অবস্থা হবে যদি আমরা ভালো কাজ না করি।

অন্যান্য আজাবের কথা শুনালেন মাওলানা সাহেব। অতঃপর সেই কথা গুলো সানির মনকে বিগলিত করেছে, সানি কান্নাভেজা চোখে হুজুরের হাতে হাত রেখে বললেন হুজুর আমি তো অনেক গুনাহ করে ফেলেছি, আল্লাহ আমাকে ক্ষমা করবেন কি? মাওলানা সাহেব, উত্তর দিলেন আল্লাহ অবশ্যই ক্ষমা করবেন, আল্লাহ তায়ালা তো বলেই দিয়েছেন কুরআনের সূরা যুমারে বলা হয়েছে "হে আমার বান্দারা তোমরা যারা নিজেরা নিজেদের নফসের উপরে জুলুম করেছ, আল্লাহর রহমত থেকে নিরাশ হয়ো নাহ, সেই আয়াতের কথা শুনে সানির মনে আশার প্রদীপ জেগেছে। সেইদিন সানি আল্লাহর দরবারে তওবা করলো, সামনে থেকে আর গুনাহ করবে নাহ বলে প্রতিজ্ঞা করেছে, এখন সবসময় সানি আল্লাহ ওয়ালাদের সোহবতে থাকেন, এখন সানি দুনিয়ার সমস্ত সংস্কৃতি, বেহায়া-পনা ইত্যাদি বাদ দিয়ে সবসময় আল্লাহর ইবাদাতে মাশগুল থাকে"।

লেখক পরিচিতি পড়তে কিউআর কোডটি স্ক্যান করুন

মাজেদ

ইমাম হানিফা রহ. ও নাস্তিক

আব্দুল মাজেদ নুরুন্নবী

ক্ষপা আসরে নাস্তিক এলো,
কুণ্ঠা-ঝড় তার অক্ষি ভরা;
বক্ষে তার দর্প তলো,
বাক্যে দ্রোহ অগ্নি ঝরা।

বলে দুষ্ট- "খোদা যদি থাকেন,
কেনো দেখি না চোখে?
উধাত্ত ছলনা, মিথ্যার বাঁধন—
কোথায় প্রমাণ দৃশ্যত রূপে?"

আবারও দুষ্ট ছুড়িলো সওয়াল—
"একজন কেমনে সামলায় জগত?
সূর্য-চন্দ্র, গ্রহ-নক্ষত্র,
কেমন করে থাকে এক হাতে সব?"

অবশেষে তার হাহাকার ধ্বনি—
"যদি প্রভু জন্মহীন, অনাদি,
বলো- তিনি এলেন কোথা হতে?
শূন্য কি তবে প্রসব করিয়াছে তাঁকে?"

ইমাম তখন বজ্রকণ্ঠে,
দৃপ্ত হাসি মেখে মুখে,
বলেন—"বাতাস দেখ কি চোখে?
তবু কি অস্বীকার কর তার সুখে?"

"ঘট এক, তবু সে চালায়,
মানবদেহের শত অবয়ব;
অসীম প্রভু কেন সামলাবেন না
আসমান-জমিন, দিগন্ত-ভুবন?"

"গণনা শুরু হয় এক হতে,
শূন্য তো শূন্যই—নিঃসার বালি;
তেমনি আদি-মূল, অনাদি স্রষ্টা—
আল্লাহ, একক, চিরন্তন জ্যোতি।"

স্তব্ধ হলো আসর নিমেষেই,
ভেঙে পড়িল যুক্তির দেয়াল;
নাস্তিকের বুকে আলো ফুটিল—
তাওহীদের সূর্য জ্বলে অবিরল।

ইব্রাহিম আঃ ও নমরুদ: যুক্তির বিদ্রোহ
আব্দুল মাজেদ নুরুন্নবী

গর্জে ওঠে নমরুদ দম্ভভরে—
“আমি প্রভু, আমিই বিধাতা!
আমার নিঃশ্বাসে বাঁচে দুনিয়া,
আমার ইশারায় চলে মহাকাশপথ”!
ইব্রাহিম দাঁড়ায় বজ্র-বিক্রমে,
চোখে জ্বলে তাওহীদের জ্যোতি;
বলে—“রব আছেন, অনন্ত, অদ্বিতীয়,
তাঁরই ইশারায় কাঁপে দিগন্তমহী”।

অহংকারে নমরুদ ডেকে আনে জনে,
মারে একে, বাঁচায় আরেক প্রাণ;
চিৎকারে বলে- “দেখো এ আমিই প্রভু,
জীবন-মৃত্যু আমিই করি দান!”
ইব্রাহিম গর্জে ওঠে বজ্রকণ্ঠে—
“ওহে গর্বোন্মত্ত, অন্ধ অত্যাচারী!
রূহের উৎস, প্রাণের দীপশিখা—
তুমি কি জ্বালাতে পারো তার আগুন জারি”?

“আমার রব সূর্য তোলে
প্রতিদিন প্রাচ্যের নীল আকাশে;
যদি সত্যি প্রভু হও তবে—
ওঠাও তাকে পশ্চিমের নিশ্বাসে”!
নিস্তব্ধ হলো সভা নিমেষে,
কাঁপল প্রাসাদের লৌহদ্বার;
বিদ্রোহী কণ্ঠে ইব্রাহিম ঘোষণা—
“আল্লাহই রব! অদ্বিতীয়, অপরিসীম,
অপরাজেয় মহাধার”!

লেখক পরিচিতি পড়তে কিউআর কোডটি স্ক্যান করুন

নিয়ামত

উলট-পালট

নিয়ামত উল্লাহ আল আমিন

মুসলিম নিবে পূজায় অংশ, হিন্দু খাবে গরুর মাংস,
এ জাতের হিন্দু-মুসলিম সবাই তো নিরবংশ!

মুসলিম যাবে দুর্গা পূজায়, হিন্দু রোজার ঈদে,
উলট-পালট রীতিনীতি, মিটায় নাস্তিকের খিদে।

ধর্ম হবে যার যার, উৎসব তবে সবার,
স্বর্গ-নরক হয়না কিছু যুক্তি নাস্তিকতার।

কোনটা ভালো কোনটা মন্দ, চোখ থাকতে অন্ধ,
দাড়ি-টুপি মোল্লার গায়ে জঙ্গীবাদের গন্ধ।

নায়ক-গায়ক সংসদে যায়, জ্ঞানী কারারুদ্ধ,
উলট-পালট সাজিয়ে সব, নাস্তিক আজ মুগ্ধ।

স্মৃতিচারণে তৈরি এটি, কে বলেরে মুর্তি,
ভাষ্কর্যের দোহাই দিয়ে, চলছে পুজা-ফুর্তি।

কুরসিতে ছাগল বসে, করছে সমাজটাকে শাসন,
সাম্প্রদায়িকতার নামে, করছে ধর্মের মিশ্রণ।

হাকি আজ সাম্যের গান, আছে যার ধর্মের টান,
হিন্দু-মুসলিম সবে এক হও, নাস্তিক হটাও থাকিতে প্রাণ।

ধর্ম আমার ধর্ম তোমার, উলট-পালট নয়,
সময় আজি সঠিক খোঁজার, হবে সঠিকের জয়।

লেখক পরিচিতি পড়তে কিউআর কোডটি স্ক্যান করুন

মিজানুর

স্রষ্টা খুঁজে পাই
বি এম মিজানুর রহমান

স্রষ্টা খুঁজে হয়রান কেহ
হয় যে ভ্রষ্ট তাই,
আমি কিন্তু নিজের মধ্যে
স্রষ্টা খুঁজে পাই।

নাই যে উপায় অস্বীকারের
আছেন মোদের রব,
এতো সুন্দর নিখুঁত সৃষ্টি
অপরূপ তার সব।

রবে মোদের খেতে দিলেন
যেমন করে মুখ,
পায়ু দিলেন ত্যাগ করিতে
ভেবে ভরে বুক।

সুখটা লাগে ভ্রু দেখে ভাই
নইলে শ্রী যে নাই,
নিজকে দেখে নিত্য আমি
স্রষ্টা খুঁজে পাই।

নাই যে বলি অস্বীকারে
আবিষ্কারকে আজ,
অপরূপ এই সৃষ্টি সুধায়
স্রষ্টার চলে রাজ।

গড ডিবেট
বি এম মিজানুর রহমান

সারা বিশ্বে নানান মানুষ
নানান তাদের মত,
দৃষ্টিভঙ্গি ভিন্ন বলে
ভিন্ন তাদের পথ।
মতের সাথে মতের অমিল
ডিবেট সৃষ্টি হয়,
গড ডিবেটে এলার্জি রয়
সকল লোকে কয়।
নয় রে যারা বিশ্বাসীজন
তারা নাস্তিক লোক,
তাদের দেখে আস্তিক লোকের
বাড়ে মনে শোক।
জোকস করো না স্রষ্টা নিয়ে
সব বিশ্বাসী কয়,
সব কিছুতে তাঁহার হুকুম
জানবে সদা রয়।
নয় সদা যুক্তি বিজ্ঞান
বুঝতে হলে রব,
নাস্তিক যেজন মনে করে
ভবের জীবন সব।
রব যে আছেন বিশ্বাস বুকে
চলি মোরা রোজ,
গড ডিবেটে জয়ী পাবে
মহান স্রষ্টার খোঁজ।

লেখক পরিচিতি পড়তে কিউআর কোডটি স্ক্যান করুন

ফাতেমা

আল্লাহ আল্লাহ

ফাতেমা আক্তার শ্যামলী

আল্লাহ তুমি তো এক, তুমি আসমান-জমিনের মালিক।
সকল প্রশংসা শুধু তোমার, সকল ইবাদতের তুমি হকদার।
আল্লাহ, তুমি আরশে-আজিমের অধিপতি,
তুমিইতো বেঁধে দিয়েছ মোর নিয়তি।
মহামহিম তুমি অসীম দয়াময়,
মোরা বেঁচে আছি তোমার দয়ায়।
বিচার দিনের মালিক তুমি ক্ষমাশীল,
তুমি পৃথিবীকে করেছ বাসের যোগ্য-
দিয়েছ ফুল,ফল আর কতো ফসল।
তুমি করেছ সৃষ্টি মানব জাতি আর দিয়েছ মোদের এই পৃথিবীতে,
বলেছ তুমি জ্বীন আর মানুষকে বাঁচতে তোমার ইবাদতে।
জন্ম দিয়েছ মোরে মুসলিম ঘরে ইসলাম করেছ ধর্ম,
মরণের পরে বুঝে নিবে তুমি দুনিয়ায় করবো যত কৃতকর্ম।
তুমি রেখেছ জান্নাত-জাহান্নাম আর দিয়েছ আধাঁর- আলো,
আল্লাহ নামে প্রশান্তি আসে আর সবি লাগে ভালো।
তুমি আল্লাহ, তুমি রহমান, তুমি রহিম, তুমিই ক্বাহার,
তুমি সৃষ্টিকর্তা, তুমি রিজিক দাতা আর পালনকর্তা সবার!!
তুমি আল্লাহ, তোমারি বাণী আল-কোরআন,
তুমি মহান,তুমি মহান, তুমিই মহান।
তুমি আলিমুল গায়েব, তুমি মেহেরবান,
তুমি সৃষ্টি করেছ এ জমিন আর বিশাল আসমান।
তুমি সৃষ্টি করেছ নবী-রাসূল আর কত-শত ফেরেস্তা,
তুমি কোরআন আর রাসূলের সুন্নতে দেখিয়েছ জান্নাতের রাস্তা।
তুমি নামাজে দিয়েছ বেহেস্তের চাবি,
আর দুনিয়ায় দিয়েছ কল্যানের সবি।
আল্লাহ, যারা তোমাকে মানে তোমাতেই রাখে ভরসা,
তুমি তো মহান, তাদের তুমি দাওনা কখনো নিরাশা।
আল্লাহ ছাড়া কোনো শক্তি নেই যে তোমার-আমার,
নভোমন্ডল ও ভূমন্ডলের রাজত্ব আল্লাহর।

লেখক পরিচিতি পড়তে কিউআর কোডটি স্ক্যান করুন

শেষ সমর্পণ

যুবায়ের হাসান দুলাল

এক অদৃশ্য শিকল, যা মানুষকে বেঁধে রেখেছে অস্তিত্বের শূন্যতায়।
নাস্তিকতা, সেই শিকল, যা মানুষকে বোঝায় এই মহাবিশ্ব,
এক আকস্মিক বিস্ফোরণের ফল। ভালোবাসার উষ্ণতা,
নৈতিকতার ভিত্তি, এবং স্বপ্নের গভীরতা—সবকিছুই অর্থহীন।
নাস্তিক্যবাদের বিশ্বাস—রব নেই। ছোট্ট ফুলের পাপড়ি,
বিশাল গ্যালাক্সির সুশৃঙ্খল ঘূর্ণন —এসব কি কেবলই কাকতালীয়?
মানব হৃদয়ে লুকিয়ে থাকা দয়া, ত্যাগ, এবং ভালোবাসার জন্ম
কি শুধুই বিবর্তনের ফল? মা সন্তানের মমতা কেবলই জিনগত স্বার্থপরতা?

নাস্তিক্যবাদ মানুষকে তার অস্তিত্বের মূল থেকে বিচ্ছিন্ন করে দেয়।
যদি সব কিছুই শেষ হয়ে যায় মৃত্যুতে, তবে জীবনের কষ্ট,
সংগ্রাম, এবং ভালো কাজের মূল্য কোথায়? মানুষকে এমন এক
জগতে ফেলে দেয়, যেখানে আলো নেই, আশা নেই, কেবলই শূন্যতা।
মানুষ তো কেবল জৈব পদার্থ নয়। মানুষ তার হৃদয়ে
এক চিরন্তন তৃষ্ণা অনুভব করে, যা পার্থিব বস্তুতে মেটানো অসম্ভব।
এই তৃষ্ণা এক অনন্ত সত্তার জন্য, এক আশ্রয়দাতার জন্য। মানুষ
দুঃখে তখন স্বতঃস্ফূর্তভাবে প্রার্থনা করে। যখন আনন্দিত হয়,
কৃতজ্ঞতায় মাথা নত করে। এই অনুভূতিগুলো কি কেবলই কুসংস্কার?

এই আত্মার আহ্বানই শেষ সমর্পণ। নাস্তিক্যবাদের যুক্তি
যখন জীবনের পূর্ণাঙ্গ ব্যাখ্যা দিতে ব্যর্থ হয়, তখন মানুষ তার ভেতরের
শূন্যতা পূরণের জন্য এক পরম সত্তার কাছে ফিরে আসে। এই
সমর্পণ যুক্তির পরাজয় নয়, বরং হৃদয়ের বিজয়, নতুন দিগন্তের উন্মোচন।
নাস্তিক্যবাদ মানুষের মনে সন্দেহ ও প্রশ্ন সৃষ্টি করে, কিন্তু
তার উত্তর দিতে ব্যহত হয়। এর বিপরীতে, রবের ধারণা মানুষকে
এক পরম আশ্রয় দেয়, দুর্বলতা ও ভয় নিয়ে নিঃশর্তভাবে সমর্পিত হয়।

লেখক পরিচিতি পড়তে কিউআর কোডটি স্ক্যান করুন

জিসান

নাস্তিক তুমি মানো না স্রষ্টা কে!

মোঃ সোহাগ জিশান

বলো! কি করে আসলে তুমি
পৃথিবীর এই রঙ্গমঞ্চে
বানিয়েছো কি তুমি তোমাকে
তা যদি না পারো তুমি করতে
জন্ম কি তোমার এমনি হয়েছে
নাস্তিক তুমি মানো না স্রষ্টা কে!

স্রষ্টা যদি নাহি থাকে
তবে এত মানুষের ভিন্ন গঠন
কেন ভিন্ন পেশা,রিজিক বন্টন
হওনি কেন তুমি অন্যের মতন
অন্ধত্ব নাকি তোমার চোখে
নাস্তিক তুমি মানো না স্রষ্টা কে!

নাস্তিক তুমি বলো তবে
কোন সে শক্তি কোন জাদুতে
মেঘ থেকে কেন বৃষ্টি ঝরে
সূর্যের উদয় অস্ত কেন তবে
চিন্তা কি হয় না তোমার মস্তিষ্কে
নাস্তিক তুমি মানো না স্রষ্টা কে!

এত এত নেয়ামত ধরার বুকে
স্রষ্টা ছাড়া বিলাচ্ছে কে তবে
বিশ্বাস নেই তোমার পরজনমে
মৃত্যু তোমার হলে পরে
আত্মা তোমার কোথায় যাবে
নাস্তিক তুমি মানো না স্রষ্টা কে!

নাস্তিক! তোমার স্রষ্টা কে..?
মোঃ সোহাগ জিশান

হে নাস্তিক!
পৃথিবীতে ক্ষুদ্র বৃহৎ হাজারো সৃষ্টি
তা তো আর হয়নি এমনি এমনি
কখনো তা ভাবিয়া দেখেছো তুমি
কি করে হলো সারা জাহান সৃষ্টি।

সনাতনী ধর্মে হিন্দু শাস্ত্রে বলে
তাদের স্রষ্টা ব্রহ্মা,বিষ্ণু,দূর্গা,শিবে
ভিন্ন হলেও তাদের স্রষ্টা আছে
নাস্তিক! তোমার স্রষ্টা কে..?

খ্রিস্ট ধর্ম বাইবেল গ্রন্থে
পিতা-পুত্র আত্মার ত্রিত্ব নামে
স্রষ্টা তাদের যীশুর পিতা ঈশ্বরে
নাস্তিক! তোমার স্রষ্টা কে?

ইসলাম ধর্মে কুরআন গ্রন্থে
মুসলমানেরা বিশ্বাস করে
স্রষ্টা তাদের এক আল্লাহ পাকে
নাস্তিক! তোমার স্রষ্টা কে..?

গ্রিক রোমান চীনা গ্রন্থে
জিউস জুপিটার শাংদি নামে
আরও কিছু দেবতা রয়েছে
ভিন্ন ধর্মে আছে কত ভিন্ন স্রষ্টা
নাস্তিক! তোমার স্রষ্টা কে ?

লেখক পরিচিতি পড়তে কিউআর কোডটি স্ক্যান করুন

রেদওয়ানুল্লাহ

ওহ আল্লাহ,
আই বিলীভ ইউ এ্যান্ড লাভ ইউ সো মাচ

রেদওয়ানুল্লাহ

পেরেশানিরা যখন তাদের পসরা সাজিয়ে নেয়;
আমি আমার রবের স্মরণে প্রশান্তির আলোকবর্তিকা খুঁজে পাই।

বেদনার অমিয় রাত্রি যখন নির্ঘুম কেটে যায়।
মন-নীলাকাশ যখন কালো, বিষণ্ন মেঘে ছেয়ে যায়
ঠিক তখনি,
মুয়াজ্জিনের 'আল্লাহু আকবার' আজান-ধ্বনিতে
একটি অনিঃশেষ অপার্থিব আলোর সন্ধান পাই।

ডিপ্রেশনের বিষাক্ত চিন্তারা যখন হৃদয়-ক্যানভাসে মৃত্যু-ছবি আঁকতে শুরু করে,
আমি নিশ্চিত জানি,
কোন এক দৈবশক্তি খোদাভীরু হৃদয় থেকে এই কুমন্ত্রণা মুছে দেয়।
হাজার বছর বেঁচে থাকার দীপ্ত আশা সঞ্চার করে।

তাই, যখনই বুকের ভেতর
হাহাকার করে ওঠে একটা হালকা গুমগুম কান্না,
আমার যবানে বলি—
“হে আল্লাহ, আমি তোমায় বিশ্বাস করি, তোমায় খুব
ভালোবাসি। খুউব!”
আচানক, হৃদয়ে এক অচেনা প্রশান্তি নেমে আসে!
রহমতের নরম সুগন্ধিতে ভরে উঠে আমার দেহসত্ত্বা!
তাই আবার বলি, বারবার বলি,
“ওহ আল্লাহ, আই বিলীভ ইউ এ্যান্ড লাভ ইউ সো মাচ্!”

লেখক পরিচিতি পড়তে কিউআর কোডটি স্ক্যান করুন

মাসউদ

যে পথে ফিরি

আব্দুল্লাহ মাসউদ

আমি বেরিয়েছিলাম যুক্তির শহর পেরিয়ে,
সন্দেহের মরুভূমি পাড়ি দিয়ে,
শূন্যতার সাগরে নিক্ষেপ করেছিলাম নৌকা,
খুঁজতে—কে আঁকল এই মহাবিশ্বের ছবি?
পদার্থ বলল—আমি নিয়ম জানি,
কিন্তু নিয়মদাতার নাম বলতে পারি না।
দর্শন বলল—আমি প্রশ্ন তুলতে পারি,
কিন্তু শেষ উত্তর আমার হাতে নেই।

তারারা বলল—আমি আলো ছড়াই,
কিন্তু কে আগুন জ্বালাল, জানি না।
চাঁদ বলল—আমি আলো ধার করি,
কিন্তু উৎস কোথায়, বলতে পারি না।
সূর্য নীরব দাঁড়িয়ে রইল দিগন্তে,
মহাকাশ ভরে উঠল নিঃশব্দ সুরে,
আমি শুনলাম—কোথাও কেউ ফিসফিস করছে,
“আমি আছি, সর্বদা আছি”।

তখন আমি ফিরলাম হৃদয়ের দিকে,
দেখলাম—সেখানে তুমি আছো,
নিঃশব্দ অথচ স্পষ্ট,
যেন বৃষ্টির আগে ভিজে ওঠা মাটির গন্ধ।
সেই গন্ধে ভিজে আমি ফিরে এলাম,
শূন্য থেকে পরিপূর্ণতায়,
অন্ধকার থেকে আলোয়,
তোমার দিকেই, কেবল তোমার দিকেই।

লেখক পরিচিতি পড়তে কিউআর কোডটি স্ক্যান করুন

নূর চৌধুরী

নকশার আড়ালে নকশাকার

নুর চৌধুরী

এই নিখুঁত নীলাকাশ যেনো সৃষ্টির চাদরে আঁকা রেখা,
তুলির একটিও ভুল নেই, রঙে নেই কৃত্রিমতা।
নক্ষত্রের গতি, সমুদ্রের ঢেউ, মৌমাছির বাসা
সবই এক অদেখা সূত্রে বাঁধা, কে এঁকেছে এমন নকশা?

প্রতিটি পত্রে আছে জ্যামিতির রেশ,
গাছের ছায়াও পড়ে কোনে সুনির্দিষ্ট সুনিয়মে বেশ!
এ হিসেব, এই গতি স্রেফ "দুর্ঘটনা" বলে যাওয়া কি সহজ?

নাকি প্রকৃতি নিজেই বলে,আমারও আছে এক মহান উৎস?
শিশু জন্ম নেয় জেনে নেয় মায়ের স্তন্যদানে জীবন,
কিভাবে তার ভেতর জন্ম নেয় ভালোবাসার এই ধ্বনি,
এই চিন?

চোখে আলো লাগে চোখ জানেই না,
কিভাবে তা ধারণ করে!
এই অলিখিত বিদ্যা আসে কোথা থেকে?
কে শেখায়, কার নির্দেশে গড়ে?

তুমি বলো বিজ্ঞান জানে সব,
আমি বলি জানুক, তবু "কেন" জানেনা সব !
পদার্থ বোঝে জগত কেমন, কিন্তু প্রেম শিখায় কে সে তো অদৃশ্যই রয়ে যায়!!!

জগতের নকশা পড়ে যদি পাঠ না হয় নকশাকারের,
তবে চোখ থেকে আলো যায়, হৃদয় হারায় তার প্রহর।
কারণ যুক্তি যতই চাই ব্যাখ্যা,কিছু সত্য শুধু অনুভবে আসে
যেখানে শব্দ থেমে যায়, সেখানে ঈশ্বর নিঃশব্দে হাসে!

লেখক পরিচিতি পড়তে কিউআর কোডটি স্ক্যান করুন

ফরমান

যার তুলনা নাই

এইচ এম ফরমান আলী বদরী

সব সৃষ্টির মালিক এক যার তুলনা নাই,
দেখে চিনে যে মানে না সে দুরাত্মার ভাই।
অতি জ্ঞানী সাজে তারা স্রষ্টাকে চিনে না,
অবুঝ ঘরে বসবাস তাদের,তাহাও জানে না।
দেহ আত্মা দিছেন আল্লাহ দিছেন কত কিছু,
অন্ধজ্ঞানী বর্জন করিয়া অন্তর বানাইলি পশু।
জ্ঞান সজাগ করো হে ভাই রব কে জানো,
তিনি সবার পালনকর্তা তাহাকে মানো।
ফরমান কই জীবন মরন সবি তাহার হাতে,
ক্ষমা চাই তার কাছে পরকালে শান্তি পাই যাতে।

অস্ত আস্তিক

এইচ এম ফরমান আলী বদরী

মুর্খের দল বাহির হইল নাম তার নাস্তিক,
কত রঙে রঙিন সাজে তারা আস্ত আস্তিক।
উলট পালট কথা কয়, না আছে কোন ধর্ম,
শিউরে উঠে পশম আমার, দেখলে তাদের কর্ম।
কেমনে পারে তারা প্রভুকে অস্বীকার করে,
ইজ্জত হারায় চেহারা হয় হনুমানের যখন তারা মরে।
সুরা আনয়ামের শুরুতে আছে স্রষ্টা সৃষ্টির কথা,
টান দিলে গোড়ায়,ঠিক থাকে না নাস্তিক বাবুর মাথা।
ইসলাম কইলে পাগল হয় ভেতর বেশ জ্বলে,
ফরমান কই আছে সবি দেখ কুরআন খুলে।
তোদের কাছে কুরআন যদি নাহি লাগে বিশ্বাস,
আশেপাশে খেয়াল কর যাদের বন্ধ হইছে শ্বাস।
হায়াত মওতের মালিক তিনি মহা দয়াকারি,
স্বর্গ পাবি তুই মনিষী করলে তাহার তাবেদারি।

দেখি নাই খুজি তারে
এইচ এম ফরমান আলী বদরী

দেখি নাই খুঁজি তারে,
ক্ষমা চাই বারেবারে,
কি প্রেম জমছে মাবুদ আমি জানি না।
আমি কে আমি জানিনা,
কি সরাব খাইছি আমি চিনি না,
না দেখে তুলে হাত চাহি কেন আমি জানি না।

জিকিরও করি তার,
দেখা হয়নি সাথে যার,
কি আজব খেলছে সে জন আমি বুঝি না।
কনকনা শীতে উঠে ডাকি তারে,
সিজদায় লুটিয়ে পড়ে খুজি তারে,
তারি সনে করি প্রেম, কেন করি তাও জানি না।

অন্ধের মতো বন্ধ করি দুটি আকিঁ,
পাগলে মতো ক্রন্দন করিয়া তারে ডাকি,
কেন করি আমি, কেন করি তাহাও জানি না।
ধ্যানে বসে খুঁজি সত্য,
মাতাল হয়ে করি নিত্য,
কেন করি কেন করি তাহাও জানি না।

আর করিও না পাগল আমায়,
মন কান্দে দেখবো তোমায়,
দেখা দাও মালিক আমার এই মন আর মানে না।
হুঁশ থাকতে ফরমান চাই,
মুর্শিদ ক্বাবায় দাও ঠাঁই,
সুখ আছে দাসত্বে, নাই রাজত্বে তাহা অবুঝ বুঝে না।

সবি মোর
এইচ এম ফরমান আলী বদরী

সবাই বলে সবি মোর,
যমে বলে মৃত্যু নহে দূর।
আপনকে সওয়াল কর,
মনের আবরণ দূর কর।

অল্প হায়তে এসেছো,
তাতে তুমি কি করেছো।
বেলা থাকতে এসো ফিরে,
নুরী খোদার কদম ধরে।

ফরমান বলে নাহি লাজ,
খোদা প্রেমের করিতে কাজ।

দাও জ্ঞানের দৃষ্টি
এইচ এম ফরমান আলী বদরী

আকাশ সৃষ্টি বাতাস সৃষ্টি সবি সৃষ্টি তার,
তিনি মালিক রহিম রহমান তুলনা নাই যার।
বিশ্বাস যদি না থাকে তাহার উপরে,
জীবন মরন বিশ্বাস করো দেখো কবরে।

কত নেতা বীর সেনা ছিলো এই সংসারে,
হায়াত যখন শেষ হলো গেলো খোদার দারে।
ভেবে দেখো তালাস করো আপন ঘরে,
অজ্ঞের সর্গে না থেকে স্রষ্টার দিকে এসো ফিরে।

ফরমান কই স্রষ্টার দলিল এই জগৎ সৃষ্টি,
বেভুলা মন না হয়ে দাও জ্ঞানের দৃষ্টি।

দয়ার সিন্ধু
এইচ এম ফরমান আলী বদরী

মুখে রাখুন তার নাম যিনি খোদা রহমান,
ছন্দ সাজাও সুর তুলে গাও তুমি তার গান।

দিবা রাতে দয়া করেন মালিক মেহেরবান,
তিনি সবার ত্রানদাতা পালনকর্তা বড় দয়াবান।
অন্তরজামি প্রভু তিনি কলবে লিখ তার শান,
প্রেম কর তাহার সনে তিনিই গফুর রহমান।

অলি গাউছ কুতুব হয়ছে জীবন করে কুরবান,
জীবন ধন্য হলো তাদের, হলো সোনার চান।
ক্রন্দন করে হাত তুলে ক্ষমা চাই ফরমান,
তুমি ছাড়া নাই কেহ দয়ার সিন্ধু ওহে রহমান।

দেবোনা থাকতে সুখে
এইচ এম ফরমান আলী বদরী

খাতায় নয় গ্রন্থে নয় অন্তরে লিখবো তাহার নাম,
খেয়ে তার প্রেমসুধা মস্তক ঝুঁকে দন মোর কাম।
নৈরাশ করিয়েন না মোরে হে দয়াল রহমান,
তোমার প্রেমের দাও সুধা তুমি মুনিব মেহেরবান।

তুমি দয়ার গফুর বলেই পাই মোরা পানাহার,
তবুও মানব তোমায় ভুলে যায় কি আজব কারবার।
তোমায় ভুলে শয়তান নাস্তিক রুঢ় করে আছে পড়ে,
এইসব শুনে মোর হৃদয়ে আঁখিতে অশ্রু ঝরে।

মানে না মোর মন কহে না কথা দেয় না পায়েস মুখে,
শক্তি দাও, নাস্তিক্যবাদ দিবো ভেঙে, দেবোনা থাকতে সুখে।

লেখক পরিচিতি পড়তে কিউআর কোডটি স্ক্যান করুন

কাইয়ুমা

ঈমানের আলো

কাইয়ুমা আক্তার

অন্ধকারে ঢেকে গিয়েছিল অন্তরের প্রাঙ্গণ,
সংশয়ের ঝড়ে কেঁপেছিলো বিশ্বাসের অঙ্গন।
চোখে দেখিনি তাঁকে তবু অন্তর জানে,
যে স্রষ্টা আছেন—নিঃশব্দ মহিমায় আকাশের টানে।

রাত্রি যখন গাঢ় হয়ে নামে নিস্তব্ধ আকাশে,
প্রশ্নেরা জেগে ওঠে—মনকে দেয় দংশনে।
কোথায় আল্লাহ? কেন দেখি না তাঁকে?
দুনিয়ার শৃঙ্খল কে গড়লো তবে?
তারপরই জাগে বুকে ধ্বনিত এক সুর,
"তুমি কি দেখোনি নক্ষত্রের নীল নূর?
কে ঝুলালো আকাশ, কে দিলো তার পরিমাপ?
কে লিখলো সাগরে জোয়ার-ভাটার প্রতিটি চাপ"?

যদি বলো—বিজ্ঞান! তবে বিজ্ঞানের সীমা কোথায়?
প্রমাণ দেয় কেবল নিয়মের, স্রষ্টাকে পায় না কভু ছোঁয়ায়।
বিজ্ঞান তো কেবল আয়না, প্রতিফলন তার,
আর আয়নার পেছনে লুকিয়ে থাকে নির্মাতা মহানকার।

শুনো, মানুষের হৃদয়ও দেয় প্রমাণ,
সুখে-দুঃখে সে ডাকে শুধু এক নাম।
বিপদে পড়ে কাঁদে "আল্লাহ্! বাঁচাও আমায়,"
অজান্তেই মুখে আসে সেই নামের মহিমায়।

একদিন আমিও ডেকেছিলাম কান্নার ভেতর,
যখন পৃথিবীর কাছে হয়নি কিছু আর অবশিষ্ট ঘর।

কোনো মানুষ এগোয়নি, কোনো বন্ধু পাশে থাকেনি?
তখনি দেখলাম দয়া—যা আসমান থেকে নামে নিঃশব্দে বয়ে।

আয়াতেরা হলো শীতল বৃষ্টিধারা,
কুরআনের প্রতিটি শব্দ যেন অমৃত ধারা।
"অতএব, নিশ্চয়ই আমি নিকটবর্তী"—
এই আয়াত ছুঁয়ে দেয় ভাঙা হৃদয়,
দুঃখমৃত্তিকা ভিজে যায় নীরব স্নিগ্ধবীথি।

তাহলে সংশয়ের কি স্থান থাকে?
অস্তিত্বের যুক্তি কি বৃথা ফাঁকে?
আকাশ-তারকা, পর্বত-নদী, প্রতিটি কণার গতি,
সবই তো আল্লাহর অস্তিত্বের দৃশ্যমান সাক্ষ্যগীতি।
ঈমান মানে দেখা নয়—অন্তরে প্রমাণ,
যেখানে যুক্তি নত হয়, মাথা করে সিজদাহ দান।
বিজ্ঞান ও ধর্ম নয় কখনো প্রতিদ্বন্দ্বী,
বরং একই সত্যের পথে দুজন সহযাত্রী।

তুমি যদি চাও আলো, ছুটে আসো তাঁর দ্বারে,
যেখানে মুছে যায় সংশয় শান্তি নামে অন্তরে।
আল্লাহই সেই প্রেম—যাকে মাপে না কোনো তুলাদণ্ড,
তিনি ছাড়া দুনিয়ার প্রতিটি যুক্তি হয় নীরব, ম্রিয়মাণ, গণ্ড।

আজও আমি হাঁটি অশ্রুর স্রোত বেয়ে,
কেঁদে বলি— "হে রব্ব, আমায় আঁকড়ে নাও বুকে নিয়ে"।
তুমি ছাড়া কারো কাছে নেই কোনো আশা,
তোমার নামেই ডুবে যায় অন্তর ভালোবাসায় ভরা ভাষা।

ওহে সংশয়ের যাত্রী, থামো একটু শোনো,
তুমি যাকে খুঁজছো—তিনি তোমার অন্তরেই রোনো।
শুধু চোখ নয়, হৃদয় দিয়েই দেখ,
ঈমানের আলোয় দুনিয়া পাবে এক নতুন দিক।

লেখক পরিচিতি পড়তে কিউআর কোডটি স্ক্যান করুন

রু'মা

আলোর খোঁজে

রুমা রহমান

রাত গভীর, নিঃশব্দে ভেসে যায় মন,
প্রশ্নের ছায়া ঘিরে রাখে অন্তরের বন।
চোখে দেখা যায় না, যুক্তি বলে—"এ কি সত্যি?"
তবু হৃদয় শোনে নীরব এক অমলিন সাড়া।

এক ফোঁটা আলো, অদৃশ্য, স্পর্শহীন,
কিন্তু শান্তি দেয় অন্তরের ভেতরীন।
সংশয়ের অন্ধকারও হালকা হয় ধীরে ধীরে,
ঈমানের ডানায় ভরে আসে আশার ভিড়ে।

অদৃশ্যতায় খুঁজে পাই সৃষ্টির মৃদু ছোঁয়া,
চোখে না দেখা, হৃদয়ে দেখা আলোর ধারা।
প্রশ্নের ঢেউয়ে হোঁচট খায় মন,
কিন্তু শোনে স্রোতের নীরব বাণী—
"আমি আছি, ভ্রান্ত হও না, চল পথের ধরণী"।

যেখানে মিলিত হয় বিশ্বাস ও যুক্তি,
সেখানে আল্লাহর উপস্থিতি অমলিন।
রাত যত দীর্ঘ, আলো তত গভীর হয়,
ঈমানের বাতি জ্বলে প্রতিটি প্রহরে।
হেঁটে চলি এই পথে প্রতিদিন,
আলোর খোঁজে, ঈমানের ডানায় ভর দিয়ে মন।

নামাজের আলো
রুমা রহমান

প্রথম আলো মাটির কোণে পড়লে,
হৃদয় মনে পড়ে আল্লাহর পথে।
চোখে দেখা যায় না, তবু অনুভব করি,
প্রতিটি নিঃশ্বাসে তাঁর সান্নিধ্য পাই।

নামাজের মাটিতে কাঁদি শান্তির জন্য,
হাত ওঠে, মনে হয়—এ আলো কখনও ফুরাবে না।
সূর্যের রঙ, চাঁদের আলো,
সবই জানায়, স্রষ্টা আছে প্রতিটি কোণে।

যখন জীবন হয় দুঃখের ভরা,
নীরব দোয়া শোনায় হৃদয়কে ধরা।
বাতাসে, বাতাসের ছোঁয়ায়, শিশুর হাসিতে,
প্রতিটি ক্ষণে আল্লাহর প্রতিফলন পাই।

ঈমানের ডানায় ভর করে মন,
প্রতিটি রাতে আলো জ্বলে অন্তরের ভেতর।
সৃষ্টি যতই রহস্যময়, প্রশ্ন যতই আসে,
নামাজের আলোই দেয় শান্তি, শান্তির কাছে।

অদৃশ্য সঙ্গী
রুমা রহমান

আমি তাঁকে দেখি না,
তবু প্রতিটি সকালে শুনি তাঁর ডাক।

হাওয়ার খোঁচা, পাখির উড়ে যাওয়া,
সবকিছু বলে—"আমি আছি, ভয় কিসের?"

রাতের নীরবতায় মন যখন ভয় পায়,
এক ফোঁটা আশা ঝরে আসে অন্তরের কোণায়।

প্রশ্ন যতই আসে, সন্দেহ যতই বাড়ে,
হৃদয়ে বাজে তাঁর নীরব প্রতিধ্বনি।

যখন আকাশের তারাঁরা মিলে আলো ছড়ায়,
আমি বুঝি, তিনি আছেন প্রতিটি কোণে।

শিশুর হাসি, নদীর স্রোত, ফুলের সৌরভ,
প্রতিটি ক্ষণ শেখায়—আল্লাহ সব জিনিসে।

অদৃশ্য সত্যের কাছে বিশ্বাস আসে ধীরে,
এ আলোয় ভরে ওঠে আমার ছোট্ট মন।

লেখক পরিচিতি পড়তে কিউআর কোডটি স্ক্যান করুন

রিদুওয়ান

হে শাফায়াতকারী
রিদুওয়ান সিকদার

এ জীবন কাটালাম হায় অহেতুক রঙ-তামাশায়,
বহুবার শুনেছি ডাক, তবু হারালাম দাম্ভিকতায়।
মৃত্যুর কথা ভুলে গিয়েছি, গাফিলতিতে ডুবে ছিলাম,
জেনেও ছেড়েছি রহমতের পথ, নিয়তিই ডেকেছে ধ্বংস-দ্বারে।

আমার সবই ধ্বংস করেছি, হারিয়েছি সব রহম খোদার।
এতোদিন পর কূল না পেয়ে এসেছি রাহে প্রেমের সুধার।
অর্থ, প্রতিপত্তি, প্রেম—সবকিছুতেই অবশেষে পরাজিত,
যে পথে চিরসুখ, মুক্তি, প্রশান্তি—সেসবেই আমি প্রতারিত।

অসহায় আমি খুঁজে ফিরি, শেষ সময় বড়ই ক্লান্ত,
হে মার্জনাকারী! শান্তি দাও এই রুহুকে, যে হয়েছে পথশ্রান্ত।
হে শাফায়াতকারী রাসুল (সঃ), ফেরেশতা কি পৌঁছে দেয় আমার দুরুদ?
আজ আমি নিরুপায়, বিদীর্ণ হৃদয়ে, দিশেহারা এক অপার সুবোধ।

হে হাউজে কাউসারের সাকী, মিলবে কি সেই সুধাময় পানি?
মহাপ্রলয়ের দিনে তুমি দিও শাফায়াত, হে দয়ার খনি।।

প্রত্যাবর্তন
রিদুওয়ান সিকদার

হে উদীয়মান সূর্যের, শাশ্বত চন্দ্রের মালিক।
হে বিশ্বভূমির অধিকারী, এবং অনস্বীকার্যভাবে আমারও প্রভু।

এ কোনো অবাঞ্ছিত নয় যে তোমার প্রেমময় চরণে আমি আমার মস্তক ঝুঁকিয়ে দিয়েছি।
এ কোনো মিথ্যা কিংবা অভিনয়ও নয়—এ সত্য, মহা সত্য যে—
আমি আমার অদৃষ্ট আর অনবগত হৃদয় নিয়ে তোমার সম্মুখে হাজির হয়েছি।

হে মানবজনমের সৃষ্টিকর্তা,
আমি আমার জীবনের প্রত্যাবর্তন ঘটিয়েছি।
প্রত্যাবর্তন ঘটিয়েছি নিজেকে লোভ-লালসার জীবনযাপন থেকে।

অবশ্যই আমি অনবগত, হে মহামহিয়ান,
আমার রুদ্ধ শ্বাস কোন মুহূর্তে থেমে যাবে—তা আমি নিতান্তই জানি না।
আজ তোমায় ডাকার পেছনে কার অবদান, কার হাতছানি—সেও আমি জানি না।
কীভাবে আজ জায়নামাজে জর্জরিত চক্ষু নিয়ে তোমার কাছে আত্মসমর্পণ করলাম,
সত্যিই আমি অনবগত।

হে প্রভু, হে অন্তর-বিচরণকারী!
তোমার কাছে এসে এই অজ্ঞতার কথা স্বীকার করার পরও—
তুমি কি আমায় ক্ষমা করবে না?
তুমি কি আমার প্রশস্ত মনের অস্বস্তি দূর করবে না?
তুমি কি আমায় চিত্তস্থিতির অনুভূতি অর্জনে পথ দেখাবে না?

যদি রহম করো হে বিশ্বভুবনের অধিপতি,
আমার অঙ্গ-প্রত্যঙ্গের অজ্ঞতার কাঠগড়া না মেপে—
আমার বিশ্বাস আর সমর্পিত চক্ষুজলের বিনিময়ে
গড়ে রাখা জান্নাত তুমি আমাকে উপহার দিও।।

লেখক পরিচিতি পড়তে কিউআর কোডটি স্ক্যান করুন

মার্ফিয়া

কেনো করো অবিশ্বাস?

মার্ফিয়া জান্নাত মীম

তুমি বলো, আল্লাহ নেই
তাহলে কে তোমায় করলো সৃজন?
কে গড়লো এ ধরনী?
কে দিলো এই জীবন?
আকাশ-বাতাস, চন্দ্র-সূর্য,
কে করলো সৃষ্টি?
আসমান থেকে নেমে আসা ফোটা ফোটা বৃষ্টি?
অদৃশ্যে বিশ্বাসী নও তুমি, স্রষ্টাকে করোনা বিশ্বাস।
বাতাসেরাও তো অদৃশ্য , তবু কেনো নাও নিশ্বাস?
ভালোবাসা অদৃশ্য দেখা যায় না কভু,
তবু কেনো ভালোবাসো?
মায়ের আঁচলে ভালোবাসার পরশ মাখো?
আল্লাহর জমিনে থেকে তুমি বলো আল্লাহ নাই।
তুমি আল্লাহকে মানো না তাই,
পাপের মাঝে পরে থাকো সদাই।
একি তুমি জানো?
দিয়েছেন তোমায় রহমত ও নেয়ামত,
দিয়েছেন সুন্দর এক জীবন।
তবুও তুমি অস্বীকার করো নাই মালিক রহমান।
বিশ্বাসী নও তুমি তাই তুমি নাস্তিক
আল্লাহকে বিশ্বাস না করিয়া তুমি ভুল পথের পথিক।
মরলে বুঝবে তুমি পাবে না যখন কোনো পথ।
বিশ্বাস তখন করিলেও আর হবে নাকো লাভ।
পরোপারে সুখ পাইতে চাইলে এখনি ধরো পথ।
কুরআনকে বানাও জীবন বিধান হাদীস আঁকড়ে ধরো।
বিশ্বাসী হয়ে দেখো না একবার, এ স্বাদ পাবে না কোথাও।

ওরা আমায় ভুল বলেছিলো
মার্ফিয়া জান্নাত মীম

ওরা বললো,
তুমি বোকা, তুমি পাগল, তুমি অবুঝ
কারন তুমি পূজা করো না।
আমাদের দেখো আমরা পূজা করি রোজ,
কখনো সূর্য, কখনো চন্দ্র, কখনো বৃক্ষ
কখনো বা মূর্তির।
এগুলাতো দুচোখেই দেখা যায়, ছোঁয়া যায়
আমরা এসবেই বিশ্বাসী।
আমি তখন খোঁজে ব্যস্ত হলাম,
দীর্ঘ পথ হাটলাম, তখনো বুঝতাম না কে সৃষ্টি জাহানের মালিক।
গভীর ভাবনায় ভাবতে শুরু করলাম,
কে এই সৃষ্টি জাহানের মালিক?
অতঃপর কুরআন পড়লাম, হাদীস পড়তে আরম্ভ করলাম,
ইব্রাহীম (আঃ) এর জীবনী পড়লাম।
খুজে পেলাম এক প্রশান্তিময় আত্মা,
সকল ফেতনা থেকে মুক্ত হলাম,
শরীরে জড়িয়ে গেলো এক ইমানরাঙ্গা চাঁদর,
এ চাঁদরের শান্তি ছিলো অতুলনীয়।
যা আমি আগে কখনো পাইনি।
আলোময় এক পথের সন্ধান পেলাম,
খুজে পেলাম শান্তির স্থান।
আমি তওবা পড়ে ইমান আনতে শুরু করলাম,
আল্লাহকে বিশ্বাস করতে আরম্ভ করলাম।
আমি আমার রবের প্রতি বিশ্বাস স্থাপন করলাম।
এসব দেখে,,,
ওরা আমায় বললো,,
তুমি কেনো স্রষ্টার প্রতি বিশ্বাসী??
গর্বিত হাসিমাখা মুখে বললাম আমি একজন সৃষ্টার সৃষ্টি তাই

সৃষ্টার প্রতি বিশ্বাসী।
ওরা বললো, অদৃশ্যে বিশ্বাস কেনো করো???
ইমান আনতে হবে আল্লাহকে বিশ্বাস করতে হবে, যিনি সৃষ্টি করলেন সব তাকে কেনো করবো অবিশ্বাস?
দীর্ঘদিন পর আমি বুঝলাম ওরা আমায় ভুল বলেছিলো।

ফিরে এসে দেখো
মার্ফিয়া জান্নাত মীম

ফিরে এসো সে পথে, যে পথে প্রভু ডাকে
ভুল পথ বর্জন করো, সঠিক পথে নেমে পড়ো
দুর করো সব মিথ্যা বলা, আল্লাহকে অবিশ্বাস করা।
যিনি দিলে জীবন তোমায়, পাঠাইলেন পৃথিবীতে।

কথা যাহাকে দিয়ে এসেছো, বিশ্বাস করবে তাকে।
এখন কেনো এমন হলো, ভুলেই গেলে সব?
কে পাঠালো, কেনো পাঠালো কে বা তোমার রব।
কথা তো ছিলো রবের তরে করবে ইবাদাত,
এখন কেনো ভুলে তুমি হলে নাস্তিক।

সত্যকে ভুল বলে মিথ্যার পথের পথিক।
আজ তুমি নাস্তিক, গর্ব নিয়ে বলো "আমি মুক্ত মানুষ"
একদিন মৃত্যর আগে বলবে, "দাও একটু প্রশ্বাস"
সেদিন কেউ পারবে না ফেরাতে, না বিজ্ঞান, না দার্শনিক বই,
যে স্রষ্টার মুখ ফিরায়েছো আজিবন, সে কি শোনাবে সদিন কই?

আজো তোমার সময় আছে, ফিরে এসো তার পথে,
তিনি ক্ষমাশীল, তিনি মাফ করেন,
তুমি শুধু বলো,ও আল্লাহ আমি ভুল করেছি,
দেখো কেমন করে ভালোবাসায় ঝরে তাঁর গগন।